প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ২০তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ৩ সাবান, ১৪৩৮ হিজরি | ৩০ শাহাদত, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩০ এপ্রিল, ২০১৭ ঈসাব্দ

গত ১০ এপ্রিল ২০১৭
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা
হযরত মির্যা মাসরূর আহমেদ (আই.) জার্মানীর ওয়াল্ডশাট-এ
নবনির্মিত মসজিদ **'বায়তুল আফিয়্যাত'** দোয়ার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন

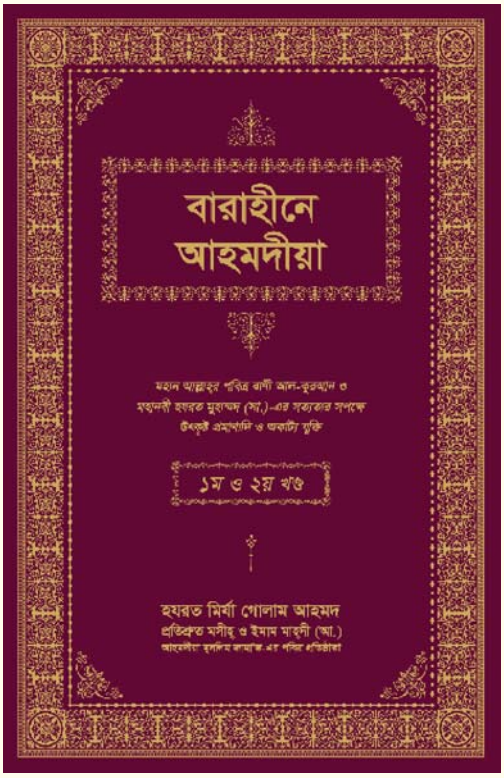

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

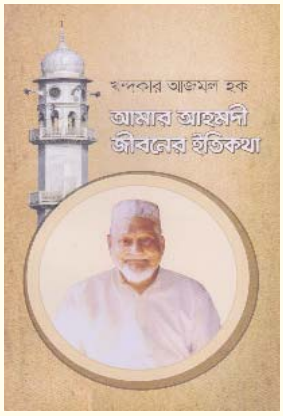

খন্দকার আজমল হক সাহেব জামা'তের একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। বহুকাল যাবত বিভিন্ন সেবা দ্বারা জামা'তের খেদমত করে চলেছেন। লিখেছেন **'কুরআন ও জীবন'** নামক একটি অনন্য পুস্তক। বলা যায়, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আহমদীর ঘরে এই বইটি রয়েছে যার মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ জামা'তের এই নিষ্ঠাবান সেবকের জীবনীমূলক বই **'আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা'** প্রকাশিত হয়েছে। জামা'তের নতুন সেবকদের জন্য এটি একটি প্রেরণামূলক পুস্তক।

পুস্তকটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। যার মূল্য ৫০/- টাকা মাত্র। জামা'তের সকলকে বইটি অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

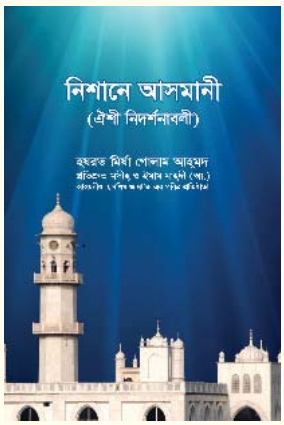

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

প্রতিবেশী সঙ্কট : উত্তরণের উপায়

বিশ্বের যেকোন স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি, সে যেকোন ধর্মাবলম্বী-ই হোক না কেন, এটা মৌলিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে সার্বজনীন স্বীকৃত ও পালনীয় এক বৈশিষ্ট্য যে, প্রতিবেশীর সাথে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে তাকে ভালবাসতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কে আমার প্রতিবেশী? সাধারণভাবে, জানা কথা এটাই যে, আমার পাশে যিনিই বসবাস করছেন, তিনিই আমার প্রতিবেশী। তবে আজকাল প্রযুক্তি সমগ্র বিশ্বকে এক পরিবারভুক্ত করে দিয়েছে।

এমতাবস্থায় বিশ্বের যেকোন স্থানে বসবাসকারী প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতিবেশী হয়ে গেছে। কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী জনসমষ্টির সামাজিক অবস্থা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে, ফলে প্রতিবেশীর সাথে আচরণগত রীতিতে প্রীতিপূর্ণ আচরণে, চিন্তা-চেতনায় ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তাটা প্রকট হয়ে উঠেছে। দ্রুত বাড়তে থাকা বড় বড় সব শহরে বহুতল ভবনের অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারীদের সম্পর্কে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিভৃত ছোট্ট পল্লী-গ্রামে বসবাসকারী জনমানুষদের ভাবনায়, 'প্রতিবেশী' বলতে ভিন্ন কিছু বুঝাচ্ছে।

আবার, আমাদের মধ্যে যারা প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত থেকে সঠিক তথ্য হাল-নাগাদ অবগত থাকেন, তারা প্রতিবেশী বলতে কেবল পাশের বাড়ীর মানুষটিকেই বুঝেন না বা একই ধর্মবিশ্বাস পালনকারীকেই প্রতিবেশী মনে করেন না, বরং দেশীয়-সীমান্তের ওপারে যারা বসবাস করেন, তাদেরকেও প্রতিবেশীই জ্ঞান করেন।

সর্বকালের সার্বজনীন শিক্ষামালায় পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে প্রীতিময় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যে সব অন্তরায় পরিলক্ষিত হয় তা চিহ্নিত করে সেসব থেকে উত্তরণের পথ-নির্দেশ করেছে। লক্ষ্যণীয় হলো, সনাতনী, ইহুদী ও খ্রীষ্টান, সচেতনতায় সমৃদ্ধ সকলেই এ বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, মানুষ এখন আর বিচ্ছিন্নভাবে জীবন-যাপন করতে পারে না। নির্যাতন নিপীড়নের কষ্টই তো ছিল, যা ইহুদীদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। তৌরাতের শিক্ষা ইহুদীদের মাঝে প্রতিবেশীর প্রতি এই ভালবাসা পোষণে এতটা নিবিড়তা এনে দিয়েছে যে, তারা বিদেশীদেরও ভালবাসতে শিখেছে, কারণ একসময় তারা নিজেরাই মিশরে পরবাসী ছিল। আর খ্রীষ্টীয় ধর্মমত, সে তো এই ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে যে, 'প্রতিবেশীকে ভালোবাস'।

আর ইসলাম, সে তো প্রত্যেক মুসলমানকে প্রতিবেশীর সাথে প্রেমপ্রীতি, সহমর্মী ও সৌহার্দ্যের এক পরিপূর্ণ শান্তিময় ও নিরাপদ সুসম্পর্কের নিশ্চয়তা বিধান করেছে।ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পরিমন্ডলে বিদ্যমান প্রতিবেশীদের অধিকার ইসলাম সুনিশ্চিত করেছে। বলাবাহুল্য যে বর্তমান বিশ্ব সামগ্রিকভাবে প্রতিবেশী সঙ্কটে নিপতিত।

নগর-জীবনে বসবাসকারী প্রত্যেকেই যেন এক অস্বস্তিকর অবস্থায় কালাতিপাত করছে। আমার পাশের ফ্লাটটিতে, বাসা-বাড়িটিতে কোন জঙ্গি বসবাস করছে না তো! আমি যে ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করি তাতে দ্বি-মত পোষণকারী কেউ বা ভিন্ন কোন সম্প্রদায়গোষ্ঠী আমাকে আক্রমণ করে বসবে না তো! আমার প্রতিবেশী দেশ আমার দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে আমাদের এই দেশটার ওপর চড়াও হবে না তো, কিংবা সমরাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করে আমার ওপর আগ্রাসী হামলা চালাবে নাতো!

পরস্পর আস্থাহীনতার এই মহা-সঙ্কট থেকে মুক্তিলাভের উপায় বাতলে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ২২ অক্টোবর ২০০৮ যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন,

"আজকের এ যুগে, পৃথিবী আক্ষরিক অর্থেই যখন এমনভাবে এক বিশ্ব-পল্লীতে রূপ নিয়েছে, যা অতীতে ছিল অকল্পনীয়, এমতাবস্থায় আমাদের জন্য আবশ্যকীয় যে, মানুষ হিসেবে স্বীয় দায়িত্ব অনুধাবন করে মানবাধিকারের সকল সমস্যা সমাধানে আমরা যেন মনোনিবেশ করি, যা বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। আর এ প্রচেষ্টার ভিত্তি হবে স্পষ্টতঃই ন্যায়নীতি ও সুবিচারের দাবি পূর্ণ করা।

ইদানিং বিশ্ব পুনরায় যখন স্বার্থপরতার সাথে বিভিন্ন ব্লকে বিভক্ত হচ্ছে, চরমপন্থী মনোভাব তীব্রতর হচ্ছে, তখন সকল প্রকার বিদ্বেষ দূর করে শান্তির ভিত্তি স্থাপন অত্যাবশ্যক। আর এটা কেবল একে অপরের সকল প্রকার আবেগ অনুভূতির প্রতি সহনশীল দৃষ্টি রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। যদি আন্তরিকতার সাথে সদুদ্দেশ্য নিয়ে সঠিকভাবে তা করা না হয়, তবে বিদ্যমান উত্তপ্তাবস্থা ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।"

আমাদের একান্ত প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের এ বোধোদয় হবে আর উল্লিখিত দিক-নির্দেশনার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে স্বীয় ভূমিকা পালনে তারা তৎপর হবেন।

সূচিপত্রে

৩০ এপ্রিল, ২০১৭

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১০
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ **জুমুআর খুতবা** ১২

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ২১

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ২৯
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা ৩২
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ৩৪

কলমের জিহাদ ৩৫
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

কাদিয়ান ভ্রমণের স্মৃতিকথা ৩৭
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

আসক্তি সৃষ্টি করায় শিশুদের জন্য মোবাইল ফোন ক্ষতিকর ৪০
মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম হাফিজ

নবীনদের পাতা– **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)** ৪১
মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ

সংবাদ ৪২

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন ৪৮

প্রচ্ছদ পরিচিতি: গত ১০ এপ্রিল ২০১৭ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমেদ (আই.) জার্মানীর ওয়্যাল্ডশাট-এ নবনির্মিত মসজিদ 'বায়তুল আফিয়্যাত' দোয়ার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। এটি জার্মানীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক নির্মিত ৫০তম মসজিদ। এতে কমপক্ষে ১০০ জন মুসল্লি একসাথে নামায আদায় করতে পারেন।

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ
بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ
اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۰۴﴾

১০৪। আর অবশ্যই আমরা জানি, তারা বলে, 'একজন মানুষই তাকে শিখিয়ে থাকে'[১৫৭৮]। (কিন্তু) তারা যার প্রতি একথা আরোপ করে, তার ভাষা তো 'আ'জামী' (অর্থাৎ অস্পষ্ট ও দুর্বল), অথচ এ (কুরআনের ভাষা) যে এক সুস্পষ্ট-প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ
لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۵﴾

১০৫। যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের হেদায়াত দিবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৬। আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে যারা ঈমান রাখে না, কেবল তারাই মিথ্যা আরোপ করে থাকে।

১৫৭৮। কাফিরদের অভিযোগ অনুযায়ী প্রচলিত কথা-কাহিনীতে এমন কিছু লোকের নাম উল্লেখ রয়েছে, যারা নাকি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কুরআন রচনায় সাহায্য করতো- যেমন, জাবার নামক এক খ্রিষ্টান কৃতদাস, আইশ বা ইয়াইশ, আল হুয়াইতিব ইবনে আব্দুল উযযা এর এক চাকর এবং আবূ ফুকাইহ, যে ইয়াসার ও আদাস বা আদ্দাস নামে পরিচিত ছিল, অউয বিন রাবীর এক কৃতদাস (মায়ানি ও ফাতহ)। আম্মর, সুহাইব, সালমান, আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং নেষ্টুরিয়ান সন্ন্যাসী সেরজিয়াসের নামও এ ব্যাপারে উল্লিখিত হয়েছে, যাদের কাছ থেকে নবী করীম (সা.) কুরআন প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করতেন বলে অভিযোগ করা হয়, যা ২৫:৫৭ আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। অপর অভিযোগটি হচ্ছে ইসলামে নবদীক্ষিত জনৈক খ্রিষ্টান কৃতদাসের কাছ থেকে মহানবী (সা.) বাইবেল শুনেছিলেন এবং তারই অংশবিশেষ কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে উত্থাপিত আপত্তির প্রতি এই আয়াত ইঙ্গিত করছে। এখন দ্বিতীয় আপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন হলো : সংশ্লিষ্ট খ্রিষ্টান কৃতদাসরা কি বাইবেলের আরবী অনুবাদ পড়েছিল, নাকি গ্রীক অথবা হীব্রু অনুবাদ? তিনি আরবীতে অনুবাদকৃত বাইবেল পাঠ করলে প্রমাণ করতে হবে, মহানবী (সা.)-এর যুগে বাইবেল আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং তা সাধারণ্যে এত প্রচলিত ছিল যে, কৃতদাসেরা পর্যন্ত দোকান-খামারে কাজ করার সময়ে তা পাঠ করতো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় পর্যন্ত কোন ভাষাতেই বাইবেলের অনুবাদ করা হয় নি। এমন কি মদীনার ইহুদী গোত্রগুলো তখন পর্যন্ত তাদের তওরাতের অনুবাদও আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে পারে নি এবং যখনই নবী করীম (সা.) এই কিতাবের প্রয়োজন মনে করতেন তিনি বিখ্যাত হিব্রু ভাষাবিদ পণ্ডিত আবদুল্লাহ বিন সালামের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ডক্টর আলেকজান্ডার সোটার এমএএল এল, ডি তাঁর রচিত দি টেস্ট এ্যান্ড ক্যানন অব দি নিউ টেস্টামেন্ট (২য় সংস্করণ-১৯২৫, পৃ: ৭৪) পুস্তকের আরবী অনুবাদ শিরোনামের অধ্যায়ে লিখেছিলেন, 'সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেকার নয়। আরবী ভাষায় দু'টি তরজমা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় করা হয়েছিল বলে জানা যায়।' রসূল করীম (সা.)-কে যদি এক নবদীক্ষিত খ্রিষ্টান কৃতদাস হিব্রু কিংবা গ্রীক বাইবেল পড়ে শুনাতো তাহলে সেই পুস্তক শুনে তাঁর কি উপকারে আসতো যার ভাষা তিনি বুঝতেন না এবং সেই কল্পিত লোকটি [যার সাহায্যে তিনি (সা.) কুরআন রচনা করতেন বলে আপত্তি] ছিল একজন আ'জামী (ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণকারী বিদেশী ব্যক্তি)। সে আরবী ভাষায় (ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা) কুরআন মজীদের মহান ও চিরন্তন সত্যসমূহ কিরূপে রসূল করীম (সা.)-কে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারতো, অথচ এ ধরনের তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন আরবী ভাষায় প্রগাঢ় ও সুগভীর জ্ঞান (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী দ্রষ্টব্য)।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়

যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব।

কুরআন ঃ "তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় গুনাহ্‌ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার! মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো । তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা ও মিথ্যাচারিতা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, এ তিনটি বড় গুনাহ্‌ মানুষকে খোদা থেকে দূরে সরিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন-ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাতা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

মহান সৃষ্টি কর্তার পরিচয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সেই ব্যক্তি অন্ধ, যে তাঁর গভীর শক্তিনিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসব কাজ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, সে সব ছাড়া বাকি সবই তিনি করেন এবং করতে সক্ষম। আপন সত্তায়, গুণে, কার্যে ও শক্তিতে তিনি এক-অদ্বিতীয়, এবং তাঁর নিকট পৌঁছবার নিমিত্ত একটি ভিন্ন অপর সকল দ্বারই রুদ্ধ। এই দ্বার কুরআন মজীদ উদঘাটন করেছে।

"তাঁর কুদরতসমূহ অপরিসীম ও অনন্ত এবং তাঁর বিস্ময়কর কার্যাবলী কুলকিনারা বিহীন। এবং তিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের জন্যে তাঁর নিয়ম-নীতিকেও বদলে দেন। কিন্তু এ বদলানোর ব্যাপারটিও নিয়মেরই আওতাভুক্ত। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দ্বারে এক নতুন আত্মায় উপস্থিত হয় এবং কেবলমাত্র তাঁর তুষ্টিলাভের জন্যে নিজের মধ্যে বিশেষ এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে তখন খোদা তা'লাও তার জন্যে নিজের মধ্যে এক রকমের পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। অন্য কথায়, সেই বান্দার প্রতি যে খোদা প্রকাশিত হলেন, তিনি যেন ভিন্ন কোন খোদা, যেন সে খোদা নন যাঁকে সাধারণ লোকে জানে। যার ঈমান দুর্বল সেরূপ ব্যক্তির কাছে তিনি দুর্বলের ন্যায় প্রকাশিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সমীপে এক মজবুত ও শক্তিশালী ঈমান নিয়ে উপস্থিত হয় তিনি তাকে দেখিয়ে দেন যে, তার সাহায্যকল্পে তিনিও শক্তিশালী। অনুরূপভাবে মানবীয় পরিবর্তনসমূহের মোকাবেলায় ঐশীগুণাবলীতেও পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি ঈমানী অবস্থার ক্ষেত্রে শক্তিহীন যেন সে মৃত, খোদা তা'লাও তাকে তাঁর সাহায্য দানে হাত গুটিয়ে নীরব হয়ে যান যেন নাউযুবিল্লাহ্ মরে গিয়েছেন। কিন্তু এ যাবতীয় পরিবর্তন তিনি তাঁর নিয়ম-নীতির আওতার মধ্যেই নিজের পবিত্রতা অনুযায়ী করে থাকেন। এবং যেহেতু কোন মানুষই তাঁর নিয়মের শেষ সীমা-রেখা টানতে অক্ষম, সেহেতু কোন অকাট্য দলিল ব্যতিরেকে যা উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট হয় ত্বরিৎ এরূপ আপত্তি করা যে, অমুক বিষয়টি প্রকৃতিবিরুদ্ধ, বোকামী বৈ কিছুই নয়। কেননা যে জিনিসের এখনও সার্বিক সীমারেখা চিহ্নিত হয়নি এবং কোন অকাট্য দলিলও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে সম্বন্ধে কে-ই বা রায় দিতে পারে!"

(চশমায়ে মা'রেফাত পৃঃ ৯৬, ৯৭)

"তিনি জড়-চক্ষু ছাড়া দেখেন, জড় কর্ণ ছাড়া শুনেন এবং জড়-জিহ্বা ছাড়া কথা বলেন। এরূপে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন তাঁর কাজ, যেমন তোমরা দেখতে পাও যে, স্বপ্নের দৃশ্যাবলীতে কোন উপাদান ব্যতীত তিনি এক জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রত্যেক লয়শীল ও অস্তিত্বহীনকে বাস্তবাকারে প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ এভাবেই যাবতীয় কুদরত (ক্ষমতা) বিরাজিত। মূর্খ সে, যে তাঁর শক্তির মহিমা অস্বীকার করে। সেই ব্যক্তি অন্ধ, যে তাঁর গভীর শক্তিনিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞ। যেসব কাজ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বা তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরুদ্ধ, সে সব ছাড়া বাকি সবই তিনি করেন এবং করতে সক্ষম। তিনি আপন সত্তায়, গুণে, কার্যে ও শক্তিতে এক-অদ্বিতীয়, এবং তাঁর নিকট পৌঁছবার নিমিত্ত একটি ভিন্ন অপর সকল দ্বারই রুদ্ধ। এই দ্বার কুরআন মজীদ উদঘাটন করেছে।"

(আল্ ওসীয়্যত পুস্তক থেকে উদ্ধৃত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

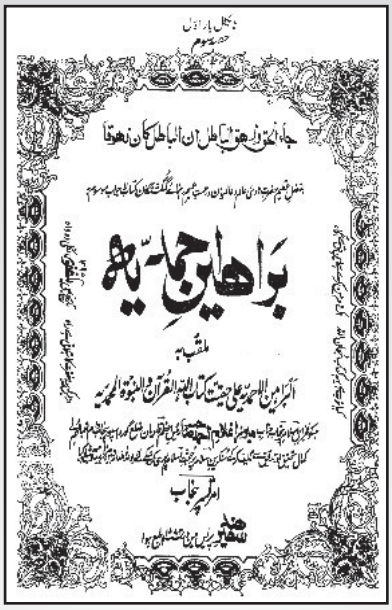

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২৯তম কিস্তি)

চলমান টিকা ১১

ব্রাহ্ম-সমাজীরা এখানে কয়েকটি সন্দেহ দাঁড় করানোর প্রাণান্তকর ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে, যাতে ঐশীগ্রন্থ গ্রহণ না করার জন্য খোঁড়া কোন ওজর-আপত্তি দাঁড় করানো যায়, ধর্মীয় ব্যবস্থাদি যাতে কোনভাবে উৎকর্ষতা লাভ না করে বরং অসম্পূর্ণ থেকে যায় আর কোথাও যেন একথা বলতে না হয় যে, খোদা সেই দয়ালু ও করুণাময় সত্তা, যিনি মানবের দৈহিক প্রতিপালনের লক্ষ্যে মানুষের খোরাকের ব্যবস্থা করার জন্য যেভাবে সূর্য, চন্দ্র, ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন; অনুরূপভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রতিপালন ও সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্য স্বীয় গ্রন্থাবলী পাঠিয়েছেন। এরা দয়ালু ও করুণাময় খোদার ওপর কার্পণ্য, নির্মমতা ও অব্যবস্থার অপবাদ দিতে চায় আর তাদের ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বাসে যেহেতু স্রষ্টা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কুধারণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অবমাননাকর বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়, তাই এ বিষয়ে তাদের যত সন্দেহ বা কুমন্ত্রণা রয়েছে তা এখানে যথাসম্ভব দূরীভূত করা বাঞ্ছনীয়।

অতএব, উত্তর সহ তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম সন্দেহ :

কোন ইলহামী গ্রন্থ বানানো মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে–এ মর্মে বিতর্ক ইলহাম সংক্রান্ত মূল বিতর্কেরই একটি শাখা মাত্র। ইলহাম সম্পর্কে এটি প্রমাণিত বিষয় যে, এর কোন যুক্তির নিরিখের আবশ্যকতা নেই! তাই মানবীয় শক্তি-বৃত্তি কোন গ্রন্থের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম না কি সক্ষম– সেই বিতর্কই অর্থহীন।

উত্তর : এর উত্তর পূর্বেই কিছুটা দেয়া হয়েছে যে, যুক্তি-ভিত্তিক অনুমানের মাধ্যমে খোদা ও পারলৌকিক বিষয়ে যা কিছু ভাবা বা অনুমান করা যায়, তার সাহায্যে পূর্ণ-বিশ্বাস ও পূর্ণ-তত্ত্বজ্ঞানের কোনটিই অর্জিত হয় না। আর অনুমান-পূজারীদের হৃদয়ে যেসব কুমন্ত্রণা বা সন্দেহ উঁকি মারে, ইলহাম ছাড়া তার নিরসণ সম্ভবই নয়। কেননা, প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে এই ধারণায় উপনীত হলেও যে বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা থাকা উচিত! কিন্তু প্রশ্ন হলো, উত্তরে কে একথা বলবে যে, সেই স্রষ্টা বাস্তবে বিদ্যমান? এটি সত্য কথা যে, ভবন দেখে এক নির্মাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, কিন্তু সে বিশ্বাস আমাদের অর্জন হয়েছে অভ্যাসজনিত কারণে। এর কারণ হলো, ভবন দেখার পাশাপাশি নির্মাণ মিস্ত্রিও আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টাকে কে দেখাবে? এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস তখনই অর্জিত হবে, যখন নির্মাণ কারিগরের ন্যায় তাঁরও কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে। বুদ্ধি যদি এ মর্মে সাক্ষ্যও দেয় যে বিশ্বের কোন স্রষ্টা থাকা উচিত কিন্তু একই বিবেক-বুদ্ধি আবার বিস্ময়-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এপ্রশ্নও করবে যে, এই ধারণা সত্য হলে সেই স্রষ্টার বিষয়ে আজ

পর্যন্ত কিছুটা হলেও জানা যেতো। অতএব, যুক্তি-বুদ্ধি স্রষ্টার অস্তিত্বের পানে কিছুটা পথের দিশা দিলেও স্মরণ রাখা উচিত যে, একই বুদ্ধি লুটেরার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছে। কাউকে নাস্তিক বানিয়েছে আর কাউকে প্রকৃতি-পুজারী, কেউ কোন এক দিকে আকৃষ্ট হয়েছে আবার কেউ অন্য কোন দিকে। নিছক যৌক্তিক ধারণার ভিত্তিতে 'বিশ্বাস' কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে যার কখনও সত্যায়নই হয়নি, আর ভবিষ্যতে কোন সময় হবেও না। যুক্তি-বুদ্ধি অনুমানের ভিত্তিতে যদি বলেও যে, কোন স্রষ্টা অবশ্যই থাকা উচিত, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, কে এমন আছে, যে আমাদের পুরোপুরী নিশ্চিত করবে, এই ধারণায় কোন প্রতারণা নেই? এর বেশি যদি আমরা ভাবিও তাহলে প্রশ্ন হলো কী ভাববো? যদি বুদ্ধির বলে পুরো কাজ সমাধা করা সম্ভব হতো তাহলে কেন বুদ্ধি বা বিবেক আমাদেরকে পথিমধ্যে অসহায় ভাবে ছেড়ে দেয় আর সামনে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করে? আমাদের তত্ত্বজ্ঞান ও খোদাকে চেনার এটিই কি পরম মার্গ যে, কোন নির্মাতা বা স্রষ্টা থাকা উচিত? যে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য আমাদের হৃদয় ব্যকুল, যা তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা তত্ত্বজ্ঞান ও বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত–এমন আনুমানিক ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভর করে আমরা কি সেই চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে পারি? যদি কেবল যুক্তি বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আমাদের তা লাভ হওয়া সম্ভব হতো তাহলে আমাদের এই উক্তিই যথার্থ হতো যে, এখন আমাদের ইলহামের আর কোন প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। পরিতাপ! অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও যদি আমরা চিকিৎসার সন্ধান না করি এবং পুরো সুস্বাস্থ্য লাভের উপায় অনুসন্ধান না করি তাহলে এটি আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ বৈ-কী!

(ফারসী কবিতার অনুবাদ)

হে এলহামের অস্বীকারকারী! তোমার বুদ্ধি,
বুদ্ধিরই জন্য দুর্নাম বয়ে এনেছে

খোদাকে ছেড়ে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে অদ্ভুত এই
ধর্ম ও বিশ্বাস প্রদর্শন করছ

যতক্ষণপর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজা পরিহার না
করবে একত্ববাদের রহস্য কীভাবে সে উদঘাটন
করতে পারে?

যতক্ষণ অহমিকাকে পদতলে পিষ্ট না করবে,
পবিত্র ও অপবিত্রের ভেতর পার্থক্য তুমি কীভাবে
করবে?

যে ব্যক্তি খোদার বাণীর অনুগত সে কামনা
বাসনার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ
করেছে।

সে, অহমিকা ও আত্মগৌরব হতে
মুক্তি পেয়ে গেছে আর খোদা তালার
জ্যোতিরূপী কল্যাণের বিকাশস্থল হয়ে
গেছে।

সে, এ পৃথিবীর রীতিনীতি থেকে
এতটা ঊর্ধ্বে যে তাদের পদমর্যাদা
ধারণারও ঊর্ধ্বে।

আমরা, অবাধ্য আত্মার হাতে বন্দী
যারা, খোদার সাহায্য ছাড়া
সম্পূর্ণভাবে অকর্মণ্য ও অপদার্থ

খোদার ওহী যখন আমাদের পথ
দেখানোর জন্য অবতীর্ণ হলো (জারী
হলো), আমাদের অনেক রহস্যের
গ্রন্থি খুলে গেছে

তোর হাতে খোদার কাজ হতে পারে
না, কেন বৃথা চেষ্টা করছিস

কোথায় তুই আর তোর জ্ঞান, কোথায়
আমরা ও খোদার জ্ঞান: কত বড়
পার্থক্য!

একজন এমন যার প্রেমাস্পদ তার
সাথে আলিঙ্গন রত, আর একজন
এমন চোখ যার অধির অপেক্ষায়
দ্বারেই স্থির হয়ে আছে

একজন এমন যে স্বীয় প্রেমাস্পদের
পাশে বসে আছে, আর একজন এমন
যে অলিগলিতে হাবুডুবু খাচ্ছে।

একজন তার সকল অভীষ্ট লক্ষ্য
অর্জন করেছে আর একজন স্বীয় লক্ষ্য
অর্জনের চিন্তায় জ্বলেপুড়ে মরছে।

রহস্যমন্ডিত জগতের কথা বলতে
গিয়ে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত
তুমি নিজের বুদ্ধি নিয়ে অহংকার
কর, তোমার অহংকারের জন্য
পরিতাপ।

তোমার সকল কাজ অসমাপ্ত রয়ে
গেছে! তোমার দুর্বল বুদ্ধি কতই না
অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে!

অতএব, হে ব্রাহ্মসমাজী ভাইয়েরা! মহা সম্মানিত খোদা দেখা ও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য যেহেতু আপনাদেরকে চোখ দিয়েছেন, তাই আপনারা নিজেরাই চোখ মেলে একটু দেখুন যে, ইলহামের আবশ্যকতা প্রমাণ হয়েছে কি-না? পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যৌক্তিক প্রমাণাদির বরাতে যথাস্থানে এর বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে, সেখানে পড়ে দেখুন। এরপর খোদার ভয়ে যদি সত্যপথ গ্রহণ করেন আর পথপ্রদর্শনের পদটি খোদার জন্য থাকতে দেন তাহলে এটি মহাসৌভাগ্যের লক্ষণ হবে। অন্যথায়, যোগ্যতায় কুলালে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তা খন্ডন করে দেখান। কিন্তু উম্মাদদের মত আচরণ পরিহার করুন, যারা কারো কথায় কর্ণপাত না করে কেবল নিজেদের বুলিই আওড়াতে থাকে।

এটি কি আশ্চর্য হওয়ার মত বিষয় নয় যে, আপনারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, পদে-পদে হোঁচট খাচ্ছেন? জানিনা, এ কেমন অলক্ষুণে পর্দা যা অপসারিত হওয়ার নাম-ই নেয় না আর কেমন হৃদয় যা বুঝতেই চায় না? বিবেকের মানদণ্ডটা কোন তাকে তুলে রেখে বেমালুম ভুলে গেলেন যে, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে জ্ঞান করছেন? অলীক ধারণার পূজা করতে কে-না জানে? নুতন কী এমন উপহার এনেছেন যে কারণে আনন্দে বগল বাজাচ্ছেন? আপনাদের হৃদয়ের খিল কেন খোলে না, এর কোন কারণ আমরা খুঁজে পাই না। আপনাদের চোখ, দেখতে কেন অপারগ? বুদ্ধি আপনাদের সাথে এ কেমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করলো যে, আপনাদের মত নিবেদিত পুজারীদেরকে ছেড়ে চলে গেল?

সাথীগণ! ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন! ইলহাম ছাড়া পূর্ণ ঈমানও অর্জন সম্ভব নয়, ভুলভ্রান্তিও এড়ানো যায় না আর খাঁটি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ওপরও নিয়ন্ত্রণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। **আল্লাহ্ আছেন** বলে সর্বত্র 'সাজ-সাজ' যে রব শোনা যায়, আর সারা বিশ্ব যে **'আছেন-আছেন'** বলে তাঁকে ডাকছে, তা ইলহামেরই কল্যাণে । আদিকাল থেকে ইলহামই হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করে আসছে যে, খোদা বিরাজমান রয়েছেন।

আর এরই কারণে ইবাদতকারীরা ইবাদতের স্বাদ পায়। বিশ্বাসীদের

খোদার সত্ত্বা ও পরকাল সম্পর্কে প্রতীতি ও নিশ্চয়তা লাভ হয়। আর এটি তা-ই, যার সুবাদে কোটি কোটি তত্ত্বজ্ঞানী দৃঢ় অবিচলতা ও গভীর ঐশীপ্রেমের সুগভীর উচ্ছাস নিয়ে এই ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। এটি তা-ই, স্বীয় রক্ত দিয়ে যাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন সহস্র সহস্র শহীদ । হ্যাঁ, এটি তা-ই, যার দুর্বার আকর্ষণী শক্তির কারণে বাদশাহ্‌রা 'দরিদ্রের বেশ' সানন্দে বরণ করেছেন। বড় বড় সম্পদশালীরা বিত্ত-বৈভবের ওপর দরবেশী বা দীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এরই কল্যাণে লক্ষ-লক্ষ নিরক্ষর, অশিক্ষিত মানুষ এবং বৃদ্ধারাও দৃঢ় ঈমানের সাথে এ পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। এটি সেই তরীরই কীর্তি, যা বহুবার অগণিত মানুষকে সৃষ্টি-পূজা ও কুধারণার ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্ত করে একত্ত্ববাদ ও দৃঢ়বিশ্বাসের নিরাপদ উপকূলে পৌঁছে দিয়েছে।

সেটিই (এলহাম) অন্তিম মুহূর্তের বন্ধু আর নাজুক সময়ের সাহায্যকারী। কিন্তু নিছক-নিরেট 'যুক্তি-বুদ্ধি' নামের পর্দার মাধ্যমে পৃথিবীর যতটা ক্ষতি হয়েছে, তা অজানা কোন বিষয় নয়। তোমরা নিজেরাই বল, খোদার সৃজনী বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে প্লেটো ও তাঁর অনুসারীদেরকে বাধ্য করেছিল কে? আর শাস্তি-পুরস্কার দিবস ও আত্মার স্থায়ীত্ব সম্পর্কে (প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসা বিজ্ঞানী) 'ক্লাডিসন গ্যালেন'-কে সন্দেহের আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল কে? খোদা, যিনি প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে সম্যক অবগত, সেকথা অস্বীকারে কে এসব দার্শনিককে বাধ্য করেছিল? কে বড় বড় দার্শনিকদের দ্বারা প্রতিমা পূজা করিয়েছে? প্রতিমার উদ্দেশ্যে মোরগ ও অন্যান্য প্রাণী বলী দিতে কে বাধ্য করেছে? এটি এলহাম-বিহীন সেই বুদ্ধি নয়কি?

অধিকন্তু, এই সন্দেহ প্রকাশ করাও সমীচীন নয় যে, অনেক মানুষ ইলহামের অনুসারী হয়েও মুশরিক হয়ে গেছে, নিত্য-নতুন উপাস্য বানিয়েছে! যদিও এর জন্য খোদার সত্য ইলহাম দায়ী বা দোষী নয় বরং এটি সেসব লোকের নিজেদেরই ভ্রান্তি যারা সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে আর কামনা-বাসনার দাসত্বকে খোদার ইবাদতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদার ইলহাম তাদের সংশোধন ও দেখাশুনার বিষয়ে অমনোযোগী হয় নি, তাদেরকে ভুলে থাকে নি বরং যেসব বিষয়ে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে দ্বিতীয় ইলহাম সেসব কথার সুরাহা করেছে।

যদি তুমি বল যে, স্বল্প-বুদ্ধির লোকেরাই বুদ্ধির বিকৃতির জন্য দায়ী, উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্নরা নয়! তাহলে জেনে রাখ, একথা সঠিক নয়। এটি জানা কথা যে, নিরঙ্কুশ ভাবে ও সাকুল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধি একা কোন কাজ করার সামর্থ্য রাখে না। কেননা, এ পর্যায়ে এর রূপ হলো সামষ্টিক বা সাকুল্যের। আর স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বা ছাড়া সমষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে না বরং ব্যক্তির মাধ্যমেই সমষ্টির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু, নিছক বিবেক বা বুদ্ধির অনুসারী হিসেবে স্বপ্রস্তাবিত বিশ্বাসে যে কখনও ভুল করে নি, ঐশী বা ধর্মীয় বিষয়াদী বর্ণণার ক্ষেত্রে হোঁচট খায় নি– এমন উৎকর্ষ মানুষ দেখাতে পারে কে? যার বিশ্বাস বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ে **'আছে'** এর স্তরে পৌঁছে গেছে আর যার একত্ত্ববাদের বিশ্বাসে শিরকের কোন সংমিশ্রণ নেই এবং খোদার দিকে যার পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তণ তার প্রবৃত্তি কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত–এমন পূর্ণ মানব কোথায়? এ সম্পর্কে আমরা একটু আগেই লিখে এসেছি যে, স্বয়ং দার্শনিকদের স্বীকারোক্তি রয়েছে, নিছক বুদ্ধির জোরে ঐশী বা ধর্মীয় বিষয়ে মানুষ পূর্ণ-বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না বরং তারা একটি সন্দেহযুক্ত ও অলীক ধারণা লালন করে মাত্র। এটি জানা কথা, যতদিন কারো জ্ঞান সন্দেহপূর্ণ ও ধারণানির্ভর, বিশ্বাসের স্তর থেকে অধঃপতিত ও নিম্নমানের, ততদিন ভ্রান্তি হতে সে নিরাপদ নয়; যেমনটি কি-না অন্ধ ব্যক্তি পথ-ভোলা হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। একথা মনে করা যে, শুধু বুদ্ধির ওপর নির্ভর করলে ভুল হলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের দৃষ্টিপাতে তার সংশোধনও হয়ে যায়; তাও তোমাদের উদ্ভট বুদ্ধিরই আরো একটি ভ্রান্তি, যা এখন পর্যন্ত দূরীভূত হয় নি। কেননা আমরা ইতোপূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, দৃষ্টির ত্রুটির কারণে কোন না কোন সময় এবং কোন-কোন স্থানে মানব-বুদ্ধির অতি-ইন্দ্রীয় বিষয়ে ভুল হয়ে যাওয়া একটি অবধারিত নির্ধারণ, কোন বিবেকবান যা অস্বীকার করবে না। কিন্তু (ভালোভাবে তোমরা ভেবে দেখ) যাবতীয় ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া ও এর সংশোধন করতে পারা আবশ্যক নয়। অতএব, এমন পরিস্থিতিতে জানা কথা যে, আবশ্যকীয় বিষয়ের সমাধান অনাবশ্যকীয় বিষয় দ্বারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় হওয়া অসম্ভব বরং যা নিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিমুক্ত ও সঠিক তা-ই আবশ্যকীয় ভ্রান্তির সংশোধন করতে পারে আর যাতে

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

এর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। এরপরও (প্রশ্ন দাঁড়ায়) খাঁটি একত্ত্ববাদ খোদার ইলহাম ছাড়া অর্জন কেন সম্ভব নয়?

আর ইলহামের অস্বীকারকারী শির্‌কের কলুষ থেকে কেন মুক্ত হয় না?–এ বিষয়টি একান্তভাবে একত্ত্ববাদের মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলেই জানা যেতে পারে, কেননা সত্ত্বা ও গুণাবলীতে খোদার অন্যের অংশিদারিত্ব হতে মুক্ত থাকা এবং যে কাজ কেবল তাঁর শক্তি ও সামর্থ্যের মাধ্যমে হওয়া উচিত, সে কাজ অন্যের শক্তিবলে সাধিত হওয়ার বিশ্বাস না রাখাই হলো তৌহীদ বা একত্ত্ববাদ। এই তৌহীদ বা একত্ত্ববাদকে পরিত্যাগের কারণেই অগ্নি, সূর্য ও প্রতিমা পূজারীরা বহু-ইশ্বরবাদী বা মুশরিক আখ্যা পায়। কেননা তারা নিজেদের প্রতিমা ও দেবতাদের কাছে এমন সব বাসনা পূর্ণ করার মিনতি করে থাকে যা কেবল খোদা তা'লাই দান করতে পারেন। এখন এটি জানা কথা যে, ইলহামে যারা বিশ্বাস করে না তারাও প্রতিমা পূজারীদের মতই সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে তারা খোদার গুণে গুণান্বিত অধিকন্তু এ বিশ্বাসও রাখে যে বান্দাদের মাঝেও সেই সর্বশক্তিমানের শক্তি বা ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, তাদের ধারণা হলো, নিজেদের বুদ্ধিবলে আমরাই খোদাকে খুঁজে বের করেছি। সৃষ্টির সূচনালগ্নে আমাদের-মানবকূলের মাথায় এ ধারণা জাগ্রত হয়েছিল যে, কোন খোদা নিযুক্ত করা উচিত, আর আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার সুবাদে সে অপরিচিতির গহবর থেকে বেরিয়ে এসেছে, পরিচিত হয়েছে, সৃষ্টির প্রভু বনেছে, ইবাদতের যোগ্য আখ্যা পেয়েছে! নতুবা পূর্বে কে তাকে জানত? কে তাঁর অস্তিত্বের

খবর রাখত? আমরা বুদ্ধিমান লোকেরা জন্ম নিয়েছি বলেই তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে! প্রশ্ন হলো, এ বিশ্বাস প্রতিমা পূজারীদের বিশ্বাস হতে কোন অর্থে কম ঘৃণ্য কি? মোটেই নয়। কোন পার্থক্য যদি থেকে থাকে তা কেবল এতটুকু যে প্রতিমা পূজারীরা অন্যান্য বস্তুনিচয়কে নিয়ামতদাতা ও অনুগ্রহশীল সাব্যস্ত করে থাকে আর এরা খোদাকে বাদ দিয়ে নিজেদের তমসাচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও বুদ্ধিমত্তাকে পথের দিশারী ও অনুগ্রহকারী নির্ধারণ করে। বরং চিন্তা করলে এদের পাল্লা প্রতিমাপূজারীদের চেয়েও বেশি ভারী মনে হয়। কেননা, প্রতিমাপূজারীরা যদিও একথায় বিশ্বাসী যে, খোদা তাদের দেবতাদেরকে অনেক বড় বড় শক্তি দিয়ে রেখেছেন আর তারা কিছু উপহার-উপঢৌকন গ্রহণের বিনিময়ে পূজারীদের অভীষ্ঠ ও উদ্দিষ্ট পুরা করে দিয়ে থাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা একথা বলেনি যে, খোদাকে সেসব দেবতারাই আবিস্কার করেছে। আর এই মহান নিয়ামত অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা জানা গেছে তাদেরই বাহুবলে! এ কথা, ইলহামকে অস্বীকারকারী কেবল সেসব লোকদের মাথায় উদয় হয়েছে যারা খোদাকেও নিজেদের আবিস্কারাদির তালিকায় যোগ করেছে আর চরম গর্দভসুলভ মন-মানসিকতাবশতঃ সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে বসেছে যে, খোদার পক্ষ থেকে কখনও **'আনাল মওজুদ বা আমি বিদ্যমান-বিরাজমান'** ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় নি।

এ কৃতিত্ব আমাদেরই যারা নিজেরাই কারো বলা বা শেখানো ছাড়া তাকে আবিস্কার করেছি। সে তো ছিল ঘুমন্ত বা মৃতবৎ ব্যক্তির ন্যায় নীরব-নিথর। আমরাই অনেক মাথা খাটিয়ে, তাকে খুঁজে বের করেছি। তাদের কথায় বলা যায়, তাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহের তো প্রশ্নই ওঠে না বরং এক অর্থে, খোদার প্রতি তারাই অনুগ্রহ করল; অর্থাৎ 'খোদা'-ও যে কেউ আছেন এ কথার নিশ্চিৎ সংবাদ না পেয়েও আর তাঁর অবাধ্যতায় শাস্তি এবং আনুগত্যে পুরস্কার লাভ হয় এ বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও; তারা কাল্পনিক খোদার আনুগত্যের বেড়ি গলায় পরিধান করেছে অথচ নিশ্চিৎ ইলহামও লাভ করেনি আর কোন বাণীও শোনেনি। এক কথায় তারা নিজেরাই রান্না করলো আর নিজেরাই খেয়েও নিলো। তবে তো খোদা এমন দুর্বল ও শক্তিহীন ছিলেন যে স্বয়ং আপন সত্ত্বার সংবাদ দেবেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা সম্পর্কে বান্দাদের আশ্বস্ত করবেন– তারপক্ষে এতটুকুও হয়ে ওঠেনি। বরং তিনি লুকিয়ে ছিলেন আর তারা তাঁকে প্রকাশ করেছে! তিনি অজানা-অচেনা ছিলেন তারা তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে! তিনি নীরব ছিলেন আর তারা নিজেরাই তাঁর কাজ করেছে! বস্তুত মাত্র কিছুকাল পূর্বেই তিনি খোদা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন! আর তা-ও তাদেরই চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফসল–এ হলো তাদের হাবভাব। সকল বিবেকবান জানে যে, এ কথাটি প্রতিমাপূজারীদের কথার চেয়েও বেশি হীন ও ঘৃণ্য কেননা; প্রতিমাপূজারীরা তাদের দেবতাদের শুধু অনুগ্রহকারী ও পুরস্কারদাতা আখ্যা দিয়ে থাকে কিন্তু ইলহামের অস্বীকারকারীরা সকল সীমাই ছাড়িয়ে গেছে। তাদের দাবী অনুসারে, তাদের দেবীর (অর্থাৎ বুদ্ধির) শুধু মানুষের প্রতিই নয় বরং খোদার প্রতিও অনুগ্রহ রয়েছে, যার সুবাদে (তাদের ধারণানুসারে) খোদা পরিচিতি লাভ করেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট বিষয় যে, ইলহামে অবিশ্বাসের ক্ষতি কেবল এটিই নয় যে, তারা খোদার অস্তিত্বে কাল্পনিক ও অলীক ঈমান আনে আর বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্তিতে নিপতিত, অধিকন্তু তারা খাঁটি একত্ত্ববাদ যাকে বলে, তা হতেও বঞ্চিত এবং শির্‌কে কলুষিত। কেননা, খোদার অনুকম্পা ও নিয়ামতরাজি সম্পর্কে ধারণা করা যে, অন্যদের পক্ষ থেকে তা এসেছে, এটিইতো শির্‌ক! তা না হলে শির্‌ক আর কাকে বলে? ব্রাহ্মসমাজীরা হয়ত এখানে এ উত্তর দেবে যে, আমরা মনে করি আমাদের বুদ্ধি খোদার পক্ষ থেকে লাভ হয়েছে এবং আমরা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে বিশ্বাসী। কিন্তু স্মর্তব্য, তাদের এই উত্তর প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়। মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস হলো, যে বিষয়ে সে নিজেকে সবল-সক্ষম মনে করে বা যে কাজ নিজের শ্রম দ্বারা সাধন করে সেটিকে নিজেরই কৃতিত্ব মনে করে। পৃথিবীতে অধিকার বা মালিকানাসত্ত্ব যেভাবে বা যতটা প্রতিষ্ঠিত হয় তা কেবল এ দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে থাকে যে, প্রত্যেকেই নিজ প্রচেষ্টায় যা অর্জন করে একে নিজেরই ব্যক্তিগত সত্ত্ব ও সম্পদ জ্ঞান করে। ঘরের মালিক যদি মনে করে যে, আমার কাছে যা আছে তা খোদার, এতে আমার কোন অধিকার নেই! তাহলে চোরকে কেন ধরে আর ঋণীদের কাছে ঋণ কেন ফেরত চায়? নিঃসন্দেহে মানুষ নিজ শক্তিবলে যা কিছু করে সেই সাফল্যের বরমাল্য নিজেই গ্রহণ করে। বিশ্ব-ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে খোদা তা'লাও এ রীতিই নির্ধারণ করে রেখেছেন; সকল প্রকৃতি এরই প্রতি আকৃষ্ট। শ্রমিক পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দাবি করার অধিকার রাখে আর চাকুরিজীবিও বেতন চায়। অন্যের অধিকার অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করা মানুষকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। সারা রাত নিজ গৃহে সুখ নিদ্রা যাপন করে প্রত্যুষে ক্ষেতে গিয়ে যে দেখে, রাতে মেঘ নেমেছে আর প্রবল বর্ষণের কল্যাণে তার ক্ষেতকে অতি প্রয়োজনীয় পানিতে টুই-টুম্বুর করে দিয়েছে, সে যেভাবে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর পুরো রজনী বিনিদ্র কাটিয়ে, এক মুহূর্তও না ঘুমিয়ে জঙ্গলে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে প্রবল শীত সহ্য করে ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করে সে-ও প্রভাতে একইভাবে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে– কোনভাবেই তা সম্ভব নয় । অতএব জানা কথা, যেভাবে এ বিশ্বাসই সে রাখে না যে, আল্লাহ তা'লা মানুষকে অক্ষম, দুর্বল ও অসম্পূর্ণ, জ্ঞানহীন, প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত আর ভুল-ভ্রান্তিতে নিপতিত পেয়ে তার প্রতি করুণাবশত স্বয়ং ইলহামের মাধ্যমে সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন বরং সে মনে করে, আমরা নিজেরাই কষ্ট ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে খোদাকে চেনার ও আবিস্কারের সকল কাজ সমাধা করেছি; সে আদৌ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সেব্যক্তির মত হতে পারে না, যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, খোদা আমার কোন পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা ছাড়াই একান্ত স্নেহ ও অনুকম্পা বশতঃ আমাকে স্বীয় বাণীর মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আমি ঘুমন্ত ছিলাম খোদা আমাকে জাগ্রত করেছেন। মৃত ছিলাম খোদা আমাকে জীবন দিয়েছেন। আমি অযোগ্য ছিলাম, খোদাই আমার হাত ধরেছেন।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৬তম কিস্তি)

এ জায়গায় এ তত্ত্বটি বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, কুরআন করীমে সর্বত্র 'ইমাতাত' তথা মৃত্যুর স্থলে 'তাওয়াফ্‌ফি শব্দটি কেন ব্যবহৃত হয়েছে? এতে রহস্য বা তাৎপর্য এটাই নিহিত যে,-'মওত' শব্দটি এমন সব জিনিসের বিলুপ্তির ক্ষেত্রেও বলা হয় যেগুলো লয়প্রাপ্ত হওয়ার পর সেগুলোতে কোনো 'রূহ' বা আত্মা অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই উদ্ভিদ ও জড়বস্তুসমূহ যখন নিজেদের শ্রেণীগত আকৃতি ত্যাগ করে অন্য কোনো আকারে রূপান্তরিত হয় তখন সেগুলোর ক্ষেত্রে 'মওত' (মৃত্যু) শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যেমন বলা হয় ঃ 'এই লোহা মরে গেছে, অর্থটি ভস্মিভূত হয়ে অর্থাৎ এ ভবিষ্যত হয়ে (ওষুধ ব্যবহার্যে) 'কুশতা'য় পরিণত হয়েছে। অথবা যেমন বলা হয় ঃ রূপার টুকরাটা মরে গেছে–অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয়ে 'কুশতা'য় পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে সমস্ত জীব ও কীট-পতঙ্গ যে-গুলোর 'আত্মা' মৃত্যুর পর অবশিষ্ট থাকে না এবং যাদের ওপর পুরস্কার ও শাস্তি প্রয়োগের বিধান নেই। এগুলো মরে গেলে এদের ক্ষেত্রে 'তওয়াফ্‌ফি' শব্দ বলা হয় না। বরং কেবল এটাই বলা হয় যে অমুক জীব বা কীট মরে গেছে।

যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মহা সম্মানিত কিতাব পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে মানুষ এমন এক প্রাণী যা তার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত হয় না, বরং তার আত্মা অবশিষ্ট থেকে যায়। আত্মাসমূহের কবজকারী তথা আয়ত্তকারী (আল্লাহ্ বা ফিরিশ্‌তা) একে নিজ আয়ত্তে নিয়ে নেন। এজন্য মৃত্যু শব্দটি বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যাতে বুঝা যায় তিনি একে মৃত্যু দিয়ে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন নি, বরং কেবল এর দেহের মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং এর আত্মাকে নিজ দখলে বা আয়ত্তে নিয়েছেন। আর এ ('তাওয়াফফি') শব্দটি অবলম্বন করায় নাস্তিকদের খন্ডন করাও অভিপ্রেত যারা মৃত্যুর পর মানবাত্মার অবিনশ্বর হওয়ায় বিশ্বাসী নয়।

জানা আবশ্যক, কুরআন করীমে আদ্যোপান্ত 'তওয়াফফি' শব্দটি মানবাত্মাকে 'কবজ' করা বা আয়ত্তে নেওয়া এবং তার দেহকে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় ছেড়ে দেয়ার অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের মৃত্যুর মূলতত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপও কেবল এটুকুই যে, তাদের আত্মাকে খোদা তা'লা 'কবজ' করেন তথা নিজ আয়ত্তে নেন এবং দেহকে পৃথক করে অকেজো হিসেবে ছেড়ে দেন। আর যেহেতু নিদ্রার অবস্থাও এর মূলতত্ত্বের দিক দিয়ে মৃত্যুর উল্লিখিত অবস্থার সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেহেতু ওপরে উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে নিদ্রাকেও উপমাস্বরূপ ও রূপকার্থে 'তওয়াফ্‌ফি' বলেই অবহিত করেছেন। কেননা নিঃসন্দেহে নিদ্রাতেও একবিশেষ মাত্রায় আত্মাকে কবজ করা হয় এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। কিন্তু 'তাওয়াফফি'-এর পুরোপুরি যে অবস্থায় আত্মাকে কবজ বা আয়ত্ত করা হয় এবং দেহকে সম্পূর্ণ অকেজো করা হয়, সেটি হচ্ছে মানুষের মৃত্যু। এ কারণেই 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি সাধারণভাবে কুরআন করীমে মানুষের মৃত্যুর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। সারা কুরআন করীম জুড়ে এভাবেই শব্দটির ব্যবহার ছড়িয়ে আছে।

নিদ্রার ক্ষেত্রে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি কেবল দু'বারই এসেছে আর তাও নিদ্রা নির্দেশক শব্দ সহ এসেছে এবং এ আয়াতগুলোতে স্পষ্টত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এস্থলেও 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ দ্বারা বাস্তবপক্ষে নিদ্রা বুঝায় না বরং মৃত্যুই বুঝায়। লক্ষ্য হচ্ছে এ বিষয়টি প্রকাশ করা যে, নিদ্রাও এক প্রকার মৃত্যু বটে। এক্ষেত্রেও আত্মাকে কবজ করা বা আয়ত্তে নেয়া হয় এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। কেবল এটুকুই পার্থক্য যে, নিদ্রা একটি অপূর্ণ (বা লঘু) মৃত্যু এবং বাস্তব মৃত্যু হলো এর পরিপূর্ণ অবস্থা তথা প্রকৃত (বাস্তব) মৃত্যু।

এ বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি যে কুরআন করীমে ব্যবহার হয়েছে তা এর প্রকৃত ও মৌলিক অর্থে অর্থাৎ মৃত্যু অর্থে হোক অথবা অমৌলিক অর্থাৎ নিদ্রা অর্থে হোক– প্রত্যেক জায়গাতেই এ শব্দটি কেবল এটাই বুঝায় যে আত্মাকে কবজ করা হয় এবং মানবদেহ নিষ্ক্রিয় ও অকেজো হয়ে যায়। অতএব উপরোল্লেখিত এ অর্থটি যখন একটি স্বীকৃত বিধান হিসেবে সাব্যস্ত, তখন কুরআন করীমে **'তাওয়াফ্‌ফি'** সংবলিত সকল আয়াত যখন এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে, তখন এমতাবস্থায় যদি এক মুহূর্তের জন্য এ ভ্রান্ত ধারণাটিও গ্রহণ করা হয় যে

'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফীকা' বাক্যটির অর্থ হলো তাহলে **'ইন্নি মুনিমুকা'** অর্থাৎ 'আমি তোমাকে ঘুম পাড়াবো' তাহলে এতে করেও দেহকে আকাশে ওঠানোর কথা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়।

কেননা এ জায়গায়, **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা'**-এর পর খোদা তা'লা যে **'রাফিউকা ইলাইয়া'**– বাক্যটি বলেছেন অর্থাৎ 'আমি তোমার আত্মাকে কবজ (ধারণ) করবো, অতঃপর নিজের দিকে ওঠাবো'– এই 'রাফিউকা'-বাক্যটি 'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা'-বাক্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে এ অর্থটি প্রতিয়মান সাব্যস্ত হয় যে খোদা তা'লা আত্মাকে কবজ করেছেন, আর আত্মাকেই নিজের দিকে উঠিয়েছেন। কেননা যে জিনিসটি কে কবজ করা হয়েছে সেটিই ওঠানো হবে। দেহকে কবজ করার কথার তো কোথাও উল্লেখ নেই। অতএব নিদ্রা সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতে খোদা তা'লা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে নিদ্রাতেও মৃত্যুর মতো আত্মাকেই কবজ করা হয়, দেহকে কবজ করা হয় না। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারেন, যে-জিনিসটি 'কবজ' করা হয় সেটিই ওঠানোও হবে। এটাতো হতে পারে না যে, 'কবজ' করা হয় আত্মাকে, আর ওঠানো হবে দেহকে! এরকম অর্থ কুরআন করীমের সকল আয়াত এবং কুরআন নির্দেশিত ঐশী অভিপ্রায়ের প্রকাশ্য পরিপন্থী। কুরআন করীম নিদ্রা সংবলিত আয়াতগুলোতেও যে 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দটিকে উপমা ও রূপক হিসেবে ব্যবহার করে সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা পরিস্কার ভাষায় বলেন যে, আত্মাকে 'কবজ' করেন এবং দেহকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে ছেড়ে দেন। মৃত্যু ও নিদ্রার মাঝে পার্থক্য কেবল এটুকু যে, মৃত্যুর অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা আত্মাকে কবজ করেন এরপর আর ছাড়েন না, বরং নিজের কাছে রাখেন, এবং নিদ্রার অবস্থায় কিছুকাল পর্যন্ত আত্মাকে কবজ করেন। এরপর সেই আত্মাকে ছেড়ে দেন এবং সেটি আবার দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়।

এখন চিন্তা করা আবশ্যক, কুরআন করীমের (উপরোল্লেখিত) বর্ণনাটি কি এ বিষয়টি বুঝার জন্য যথেষ্ট নয় যে মৃত্যু ও নিদ্রা উভয় অবস্থায় দেহকে কবজ করার এবং ওঠাবার সাথে খোদা তা'লার কোনো সংস্রব নেই, বরং তিনি নিজেই যেমন বলেছেন, 'এ মানবদেহ মাটি থেকে সৃষ্ট এবং অবশেষে মাটিতেই প্রবেশ করে থাকে। খোদা তা'লা আবহমানহকাল থেকে কেবল আত্মাকে কবজ করে এসেছেন এবং আত্মাগুলোকেই নিজের দিকে উঠিয়ে থাকেন। আর প্রকৃত বিষয় যখন এটাই এবং এটাই সত্য ও সঠিক, তখন এমতাবস্থায় আমরা যদি ধরেও নেই যে, "ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' বাক্যটির অর্থ এটাই। 'আমি (হে ঈসা!) তোমার আত্মাকে সেভাবে 'কবজ' করবো যেভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মাকে কবজ করা হয়, তাহলে এতে করেও এই কবজের সাথে দেহের কোনো সম্পর্ক যোগ হবে না এবং এবং রকম (বিধান বিরোধী) ব্যাখ্যা দ্বারা কিছু প্রমাণিত হলেও সেটি এ-ই হবে যে স্বপ্নে যেমন মানবাত্মাকে কবজ করা হয় সেভাবে হযরত মসীহ্‌র আত্মাকে কবজ করা হয় এবং তাঁর দেহ স্থলে মাটিতে পড়ে থাকে। তারপর কোনো সময় (তাঁর) আত্মা (তাঁর) দেহে প্রবেশ করে।

তবে এরকম অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান বটে। কেননা কেবল কিছু সময়ের জন্য হযরত মসীহ্‌র নিদ্রা যাওয়া, অতঃপর জাগ্রত হওয়া আমাদের এ বিতর্কটির সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন। কুরআন করীমের উপরোল্লিখিত (সংশ্লিষ্ট) আয়াতটি স্পষ্টত উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মার ন্যায় হযরত মসীহ্‌র কবজকৃত আত্মাকে দেহের দিকে (ফিরে আসার জন্য) ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং খোদা তা'লা সেটি নিজের দিকে উঠিয়ে নেন। যেমন **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া'** (সূরা আলে ইমরান : ৫৬) আয়াতটিতে স্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ বর্ণিত শব্দাবলী থেকে প্রতিভাত।

ন্যায়বিচার ভিত্তিক দৃষ্টিতে দেখা আবশ্যক, যেভাবে হযরত মসীহ্‌র সপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন : **'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা'** (অর্থ 'আমি তোমাকে ওফাত দিব'), তেমনি আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সপক্ষেও বলেছেন : **'ইম্মা নুরিয়ান্নাকা বা'যাল্লাযি মায়িদুহুম আও নাতা-ওয়াফ্‌ফাইয়ান্নাকা'** (অর্থঃ 'আর আমরা তাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি এর কিছুটা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ করালে অথবা (এর পূর্বেই) তোমাকে মৃত্যু দিলে) অর্থাৎ হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের সপক্ষে এবং আমাদের মানব ও অভিবাবক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সপক্ষে উভয় স্থলে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি মওজুদ রয়েছে তা সত্ত্বেও কতো ইনসাফ বিরোধী কথা যে, আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটির ক্ষেত্রে তো আমরা সবাই মৃত্যু বলেই অর্থ করে থাকি। কিন্তু এই শব্দকে হযরত ঈসার বেলায় এর আসল ও সুপরিচিত অর্থ থেকে ঘুরিয়ে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন করীম থেকে সর্বস্বীকৃতভাবে প্রমাণিত অর্থকে পাশ কাটিয়ে স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে কিসে থেকে কী একটা মন-গড়া অর্থ তৈরি করাতেও যদি 'ইলহাদ' তথা খোদ্রোহিতা ও প্রক্ষেপ আর কী হতে পারে?! যতগুলো সুবিস্তৃত তফসীর গ্রন্থাবলী দুনিয়া জুড়ে মজুদ রয়েছে যেমন, কাশ্‌শাফ, মাআলিম, তাফসির-রাযি, ইবনে-কাসির, মাদরিফ ও ফাত্‌হুল বায়ন–এসবগুলোতেও 'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা' আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে একথাই লেখা আছে ঃ 'ইন্নি মুমিতুকা হাত্‌ফা আনফিকা' অর্থাৎ, হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব। ক্রুশবিদ্ধ বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তুমি (অস্বাভাবিকভাবে) কখনও মারা যাবে না।'

কতিপয় 'মুফাস্‌সির' (তফসীরকারক) নিজেদের অদূরদর্শিতার দরুন এ আয়াতটির ভিন্ন ধরণের কিছু তফসীর করলেও তাঁরা অলীক ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে এগুলো উদ্ভাবন করেছেন। কোনো আয়াত বা সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতিমূলে এসব করা হয়নি। তাঁরা জীবিত থাকলে তাদের জিজ্ঞাসা করা যেতো যে, আপনারা কেন এবং কোন দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে সত্রেল সাথে মিথ্যা মিশালেন? তবে তারা যখন এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাদের উপস্থাপিত বিভিন্ন উক্তিগুলোর মাঝে একটি এ-ও রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম অবশ্য অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং কেবল তাঁর আত্মাকেই উর্ধলোকে ওঠানো হয়েছিল-এমর্মে তাঁদের স্বীকারোক্তির দরুন তাঁদের অন্য সব ভুল ত্রুটি উপেক্ষাগোগ্য। তাঁদের মাঝে কোনো কোনো তফসীরকারক– যেমন 'তফসীর কাশ্‌শাফ'-এর প্রণেতা নিজ হাতে অন্যান্য সব উক্তিকে স্বীয় মন্তব্য 'কীলা' অর্থাৎ 'কথিত আছে' শব্দগুচ্ছ দ্বারা দুর্বল (তথা অগ্রহণযোগ্য) বলে সাব্যস্ত করে গেছেন।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

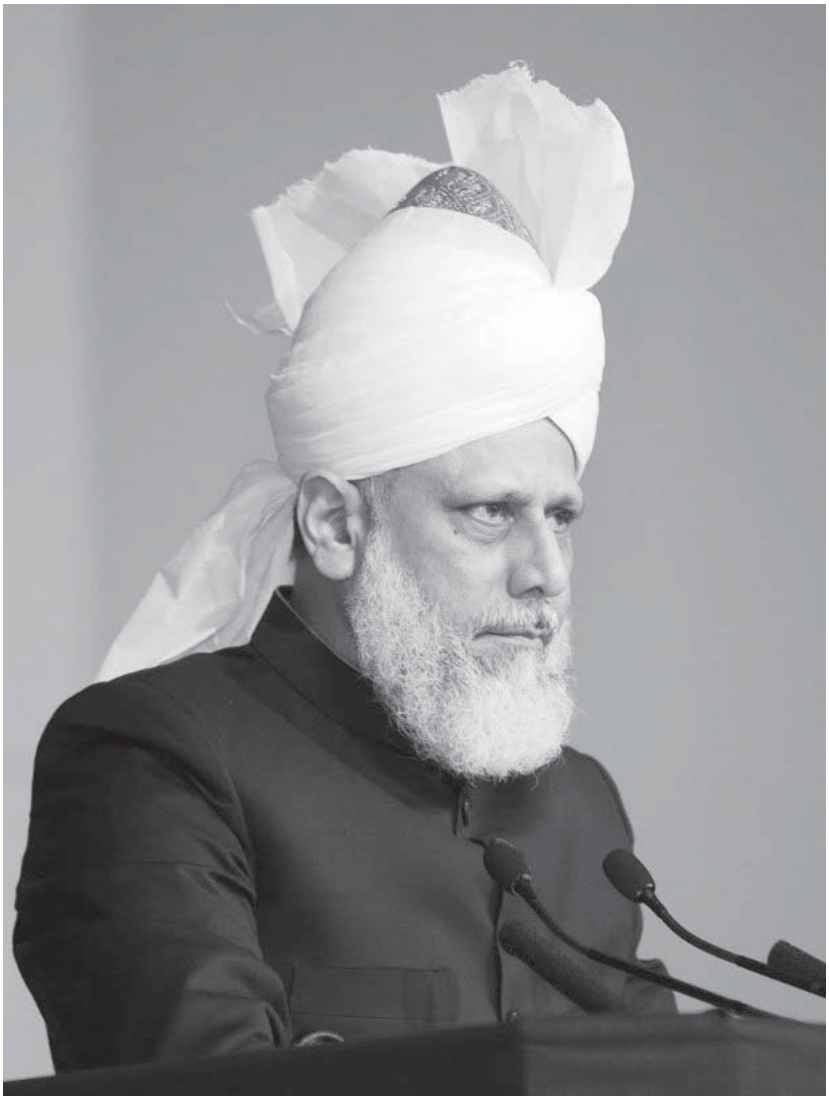

জুমুআর খুতবা

ইসলাম-আহ্‌মদীয়াতের সমর্থনে অগণিত ঐশী নিদর্শন

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যাদের চোখ পর্দায় ঢাকা পড়ে আছে, যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যে, 'আমরা মানবো না', ঐশী সমর্থন ও নিদর্শন তাদের চোখেও পরে না। নবীদেরকে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের চিরাচরিত রীতি হল, নিদর্শনাবলী দেখার পরও তারা বলে, 'আমাদেরকে নিদর্শন দেখাও'। সীমাতিক্রম করায় তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা মোহর মেরে দেন। সত্যকে আর তারা পেতেই পারে না। অনেক সময় নবীর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শনে পরিণত করে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীরাও এরূপ ছিল, দেখা সত্ত্বেও হঠকারিতা বশতঃ কোন নিদর্শনই তাদের চোখে পড়ত না। ফলে এমন অনেক 'আইয়েম্মাতুল কুফর' অর্থাৎ, কাফেরদের সর্দারই নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

স্বীয় দাবির সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লার দেখানো অনেক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এই-এই নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে আর একইভাবে রাসূলে করীম (সা.)-এর উল্লেখিত

যাদের চোখ পর্দায় ঢাকা পড়ে আছে, যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যে, 'আমরা মানবো না', ঐশী সমর্থন ও নিদর্শন তাদের চোখেও পরে না। নবীদের যারা অস্বীকার করেছে, তাদের চিরাচরিত রীতি হল, নিদর্শনাবলী দেখার পরও তারা বলে, 'আমাদেরকে নিদর্শন দেখাও'। তারা সীমাতিক্রম করায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। তারা সত্যকে আর পেতেই পারে না। অনেক সময় নবীর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিজেদেরকেই শিক্ষনীয় ও দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শনে পরিণত করে দেন।

নিদর্শনাবলীর কথাও উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তিনি (সা.) এ সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যার মধ্য থেকে এটি-এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু বিরোধী এ সব ধর্মীয় নেতা নিজেরাও মানে নি আর সাধারণ মানুষকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর এরই ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ সব নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তের সত্যতার সপক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। যে সব নিদর্শনের কথা তিনি (আ.) বলেছেন, সেগুলো বর্ণনা করার সময় বলেছেন, রসূলে করীম (সা.)ও এগুলোকে নিদর্শনই আখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোর একটি নিদর্শন হল, কুসুফ ও খুসুফ অর্থাৎ, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন। তিনি বলেন, এ নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মৌলভীরা কেঁদে কেঁদে এ হাদীস পাঠ করত। কিন্তু এটি যখন পূর্ণতা লাভ করর, কেবল একবার নয়, বরং দুইবার পূর্ণ হল, একবার দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে পূর্ণতা লাভ করল এবং দ্বিতীয়বার আমেরিকায়, তখন যারা এ নিদর্শনটি দেখতে চাইত, তারাই তাদের ভোল পাল্টে ফেলল।

যেহেতু নিদর্শনটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা এটি অস্বীকার করতে পারে নি, কিন্তু হঠকারিতা এবং গোঁয়ার্তুমি তাদের বাদ সাধে। তিনি (আ.) বলেন, আমার এক বন্ধু বলেছেন, এ নিদর্শন পূর্ণতা লাভের পর গোলাম মোর্তুজা নামের এক মৌলভী চন্দ্রগ্রহণের সময় তার নিজের রানে হাত চাপটায় অর্থাৎ, তার মনের দুঃখ ও কষ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, এখন পৃথিবীর মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে সে-ই কি বেশি হিতাকাঙ্খী ছিল? অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্লেগের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কুরআন করীমে খাল খনন সম্পর্কিত ভাবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। নতুন জনবসতি গড়ে উঠার সংবাদ রয়েছে। পাহাড় বিদীর্ণ করার সংবাদ রয়েছে। বই-পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশের নিদর্শন আর নতুন বাহনের কথাও রয়েছে। এক কথায়, বহু নির্দশনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যার সংবাদ কুরআন শরীফেও রয়েছে আর রাসূলে করীম (সা.)ও দিয়েছেন। (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮, সংকলন ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সমর্থন দেখার পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে আর এমন সব তুচ্ছ ও অযৌক্তিক আপত্তি করে, যা অদ্ভূত ও হাস্যকর। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপর্যুপরি নিদর্শন দেখিয়েছেন। এমন কিছু মানুষও আসত, যারা এসে আপত্তির ছলে বলত, তাঁর পাগড়ি বাঁকা, ইনি কিভাবে মসীহ্ মওউদ হতে পারেন? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখিয়েছেন, কিন্তু এমন কিছু মানুষও আসত, যারা বলত যে, এ ব্যক্তি সঠিকভাবে 'ক্বাফ' উচ্চারণ করতে পারে না, ইনি কিভাবে মসীহ্ মওউদ হলেন? তিনি আয়াতের পর আয়াত দেখিয়েছেন, কিন্তু এমন মানুষও এসেছে, যারা বলত, তিনি স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার বানিয়েছেন, তিনি বাদামের তেল ব্যবহার করেন, তাকে আমরা কিভাবে মানতে পারি? এই ছিল তাদের আপত্তি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না, চোখ বন্ধ করে থেকো না। অনেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে বলত, কোন নিদর্শন দেখান। তিনি বলতেন, পূর্বের নিদর্শনাবলীকে কতটা কাজে লাগিয়েছ যে, এখন আরো নিদর্শন দাবি করছো? ইতিপূর্বে সহস্র-সহস্র নিদর্শন থেকে যেখানে উপকৃত হও নি, তখন অন্য কোন নিদর্শন দেখে কিভাবে লাভবান হবে? এমন মানুষ সব সময় বঞ্চনারই শিকার হয়। (খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪-২২৫)

এমন একটি অসাধারণ নিদর্শন, যা প্রতিদিন পূর্ণতা লাভ করে, সেটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন অর্থাৎ, ইলহাম করে বলেছেন, 'রাব্বী লা তাযারনী ফার্দাও ওয়া আন্‌তা খাইরুর ওয়ারেসীন।' অর্থ- হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি নিঃসঙ্গ রেখো না, বরং এক জামা'তে পরিণত কর। তিনি নিজেই এই অনুবাদ করেছেন। অন্যত্র বলেন, 'ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব।' অর্থ- তোমার জন্য চতুর্দিক থেকে অর্থকড়ি ও সাজ-সরঞ্জাম, যা অতিথিদের জন্য আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তা সরবরাহ করবেন আর সকল দিক থেকেই

তা তোমার কাছে আসবে। তিনি আরো বলেন, 'ইয়াতুনা মিনকুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব।' সকল পথ এবং দিক থেকে তোমার কাছে অতিথিরা আসবেন। তিনি বলেন, ২৬ বছর পূর্বের এ ভবিষ্যদ্বাণী, (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬১) যখন তিনি এটি বর্ণনা করেছেন, যা আজও মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করে চলছে। এটি জামা'তের উন্নতি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, অতীতেকাল থেকে আমরা দেখে আসছি আর আজও এটি মহা-মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। তাঁর জামা'তের প্রতিনিয়ত উন্নতি করা এবং আর্থিক কুরবাণীর ক্ষেত্রে মানুষের উন্নতি করা, এটি তাঁর সত্যতার অসাধারণ একটি প্রমাণ ও নিদর্শন। কিন্তু এগুলো কেবল সে-ই দেখে, যার দেখার মত চোখ আছে। অন্ধরা তো দেখার যোগ্যতা রাখে না।

আহমদীয়াতের বিজয় এবং জামা'তের উন্নতি সম্পর্কিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু ইলহামের প্রেক্ষাপটে যেসব ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর কয়েকটি এখন আমি উল্লেখ করছি।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেও আল্লাহ্ তা'লা বার বার অবহিত করেছেন যে, জামা'তে আহমদীয়াকেও সেভাবেই কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেভাবে পূর্বের নবীদের জামা'তকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। একবার তিনি [অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] স্বপ্নে দেখেন, আমি নিজামুদ্দীনের ঘরে প্রবেশ করেছি। নিজামুদ্দীনের অর্থ হল, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা। এ স্বপ্নের অর্থ হল, অবশেষে আহমদীয়া জামা'ত একদিন ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় রূপ নিবে আর পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনার উপর বিজয়ী হবে। ইন্‌শাআল্লাহ্। কিন্তু এ বিজয় কিভাবে অর্জিত হবে? এ সম্পর্কে স্বপ্নে তিনি নিজেই বলেন, এই ঘরে আমরা কিছুটা হাসানের রীতি অবলম্বন করে প্রবেশ করব এবং কিছুটা হোসাঈনের রীতি অবলম্বন করে প্রবেশ করব। সবাই জানে যে, হযরত হাসান (রা.) যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা তিনি সমঝোতার মাধ্যমে অর্জন করেছেন আর হযরত হোসাঈন (রা.) সাফল্য পেয়েছেন শাহাদাতের মাধ্যমে।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে জানানো হয়েছে, নিজামুদ্দীনের পর্যায়ে জামা'ত অবশ্যই পৌঁছবে, কিন্তু তা কিছুটা প্রেম-প্রীতি ও সমঝোতার মাধ্যমে আর কিছুটা শাহাদত এবং কুরবানীর পথ অতিক্রম করে। আমাদের কেউ যদি এটি মনে করে যে, মীমাংসা এবং সমঝোতার পথ পাড়ি না দিয়েই জামা'ত উন্নতি করবে, তবে তারা ভুল করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, কুরবানী এবং শাহাদাত ছাড়াই এ জামা'ত উন্নতি করবে, তারাও ভুল করে। কখনো মীমাংসা এবং শান্তির দিকে যেতে হবে, আবার কখনো হোসাঈনের রীত অবলম্বন করতে হবে। এর অর্থ হল, শত্রুর মোকাবেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও দেব, তবুও তাদের সামনে মাথা নত করব না। এ উভয় রীতি আমাদের জন্য অবধারিত। আমাদের জন্য কেবল মসীহ্‌র রীতিই অবধারিত নয়, আবার মাহদীর রীতিও নির্ধারিত নয়। বরং একটি মধ্যবর্তী পথ আমাদের অবলম্বন করতে হবে। একটি বিজয় আসবে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পথ বেয়ে এবং আরেকটি বিজয় আসবে কুরবানীর রাজপথ পাড়ি দিয়ে, এরপর জামা'ত নিজামুদ্দীনের গৃহে প্রবেশ করবে এবং সাফল্য অর্জন করবে। (তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৩) এই উভয় কথারই দৃষ্টান্ত আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা জামা'তের সদস্যরা প্রদর্শন করে যাচ্ছে। সমঝোতার এবং শান্তি ও সৌহার্দের বার্তাও আমাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে আর ধর্মের জন্য জামা'ত ত্যাগও স্বীকার করছে।

আরেক স্থানে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে এবং তাঁকে যা দেখানো হয়েছে, তা পূর্বে বর্ণিত ইলহামেরই আরো খানিকটা অংশের উল্লেখ। মসজিদে মুবারকের সন্নিবেশিত যে ঘর রয়েছে, (এটি ছিল নিজামুদ্দীনের ঘর।) এতে আমরা কিছুটা হাসানের রীতি অবলম্বন করে প্রবেশ করব এবং বাকিটা করব হোসাঈনের পথ অবলম্বন করে। অনেকেই বিস্মিত হয়ে ভাবত, এই ইলহামের অর্থ কী? মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, এ ইলহামের অর্থ কী, তা জানা নেই? কিন্তু যথা সময়ে ইলহামের অর্থ

> ঐশী সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ইন্‌শাআল্লাহ্, সেই দিন অবশ্যই আসবে, যখন এ দৃশ্যও চোখে পরবে যে, জামা'তে আহমদীয়া এত উন্নতি করবে যে, এর তুলনায় অন্যান্য জাতির অবস্থা ও অবস্থান খুবই নগন্য হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় চেতনা ও প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হবে, যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দৃশ্য দেখাবেন।

প্রকাশ পায়। (খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যখন একজন মানুষও ছিল না, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিত করেছেন, তোমার জামা'ত এত উন্নতি করবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সেভাবেই থেকে যাবে, যেভাবে আজ প্রাচীন যাযাবর জাতিগুলো রয়েছে। (মিনহাজুত তালেবীন, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৩)

ঐশী সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ইন্‌শাআল্লাহ্, সেই দিন অবশ্যই আসবে, যখন এ দৃশ্যও চোখে পরবে যে, জামা'তে আহমদীয়া এত উন্নতি করবে যে, এর তুলনায় অন্যান্য জাতির অবস্থা ও অবস্থান খুবই নগন্য হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় চেতনা ও প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হবে, যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দৃশ্য দেখাবেন। যেখানে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন থাকে, সেখানে বিরোধীতাও হয়। আর নবীদের জামা'তের সাথে সব সময় এমনটি হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিরোধিতা আমাদেরকে ভীত এবং ত্রস্ত করতে পারে না। বরং ঈমানকে আরো দৃঢ় করে, ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

কয়েক দিন পূর্বে রাবওয়ার তাহরীকে জাদীদের অফিসে এবং জিয়াউল ইসলাম প্রেসে সরকারের পুলিশ বাহিনীর বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, যাদেরকে কাউন্টার টেরোরিস্ট পুলিশ বলা হয়, যাদেরকে সন্ত্রাসীদের সাথে লড়াইয়ের জন্য এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য গঠন করা হয়েছে, তারা অপ্রত্যাশিতভাবে হানা দিয়ে দুইজন মুরব্বী এবং কিছু কর্মীকে আটক করেছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাবওয়া থেকে কিছু মানুষ আমার কাছে পত্র লিখেছেন, যাদের মাঝে মহিলাও রয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল, আমরা এ সব কথায় ভয় পাই না, বরং আমাদের ঈমান দৃঢ় আছে আর এরূপ ঘটনা দেখার পর সর্বদাই বা আরো দৃঢ়তা লাভ করে। আর আমরা সকল প্রকার সমস্যা মোকাবিলা করবো এবং ত্যাগ স্বীকার করবো। এটি সেই প্রকৃত চেতনা ও প্রেরণা, যা মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত। এ সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের এমন কুরবানী দিতে হবে। খোদার প্রতিশ্রুতি এবং অপরিসীম সাহায্য ও সমর্থনের চিত্র আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করি। নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিজয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের জন্যই নির্ধারিত। বিরোধিতা তো হতেই থাকে আর হবেও। যারা হামলা করে বা হানা দেয় (হামলা নয়, বরং বলা উচিত হানা দিয়েছে) এ সব হতভাগার সবচেয়ে বড় ভয় এবং ত্রাস আহমদীদের পক্ষ থেকে বলে মনে হয়। কেননা, আহমদীরা বলে, হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি কর, খোদাকে ভয় কর। আহমদীরা বলে, খোদার পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা কর এবং তাঁকে ভয় কর। এদের মতে আহমদীরা এমন (দুঃসাহসী) কথা কিভাবে বলতে পারে? খোদা সম্পর্কে এরা আমাদের ভয় দেখায়! অতএব, এর চেয়ে বড় সন্ত্রাসী আর কে আছে, যে আমাদেরকে খোদা সম্পর্কে ভয় দেখায়! কাজেই, এদেরকে ধর আর নিশ্চিহ্ন কর।

আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে কান্ডজ্ঞান দান করুন। এদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন, তাদের বোধোদয় ঘটুক। দেশ ও জাতিকে এ সব মৌলভীদের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন, যারা প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাসী, যারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। কোন প্রাণ এদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। এই যে বিশেষ পুলিশ, সন্ত্রাস দমনকারী পুলিশ, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা সৎসাহস দিন, তারা যেন শান্তিপ্রিয় এবং দেশ-প্রেমিক ও দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আহমদীদের দিকে হাত না বাড়িয়ে এর পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে, তাদেরকেই গ্রেফতার করে, যাদের হাত থেকে জনসাধারণের জীবন নিরাপদ নয় এবং যারা দেশের মূলে কুঠারাঘাত করে চলেছে। আর তাদেরকেও, যারা দুই হাতে দেশের সম্পদ লুটপাট করছে। আহমদীদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানের সুরক্ষা করুন। এ সমস্ত অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করুন। আর কুরবানীর যতটুকু সম্পর্ক, আহমদীরা তো তা দিয়েই আসছে আর ভবিষ্যতেও দিবে। এ সব কুরবানী অচিরেই ফল বয়ে আনবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

অনুরূপভাবে, আলজেরিয়াতেও সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীদের উপর অনেক জোর-যুলুম এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন হচ্ছে। খোদা তা'লা তাদেরকেও নিরাপদ রাখুন এবং দৃঢ়তা দান করুন। সেখানকার সরকারকেও আল্লাহ্ তা'লা কান্ডজ্ঞান দিন। তারাও যেন আহমদীদের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে যে, এরা শান্তিপ্রিয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অপবাদ আরোপ করা হয়, আহমদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বা এরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় অথচ সারা পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন আহমদী কখনো দেশীয় আইনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। বরং আমরা প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রচার ও প্রসার করি। হ্যাঁ, এর জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তবে তাও করব, ইন্‌শাআল্লাহ্।

পুনরায়, আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতির দিকে ফিরে আসছি। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়াবহ বিরোধিতা হয়, শরিক বা অংশীদারদের পক্ষ থেকে।" পাঞ্জাবীতে প্রসিদ্ধ আছে, 'কষ্ট করে হলেও নিজের অংশ আদায় করতে হবে।' অতএব, সবচেয়ে বড় বিরোধিতা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কেননা, তারা সহ্যই করতে পারে না যে, তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বিশ্বের বুকে দাঁড়িয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান লাভ করবে। যারা এর প্রতিদ্বন্দীতায় প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে, তারা কিভাবে সহ্য করতে পারে যে, সারা পৃথিবী তাঁর দারস্থ হবে। তাই তারা তাকে দমনের সকল চেষ্টা করে। এমনকি, যখন তারা অসহায় হয়ে আর কিছুই করে উঠতে পারে না, তখনও তারা কোন না কোনভাবে হৃদয়ে পুষে রাখা বিদ্বেষ প্রকাশের চেষ্টা করে। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, শাহ্ কোটের রঈসদের কোন একজন যখন খান বাহাদুর উপাধি লাভ করে, তখন সেই বংশেরই এক মহিলা, যে খুব দরিদ্র ছিল, সে তার ছেলের নাম রাখে, খান বাহাদুর। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এটি কী করলে, এই নাম রাখার কারণ কী? সে বলে, জানি না আমার ছেলে বড় হয়ে কী হবে, কিন্তু মানুষ যখন নাম

যেখানে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন থাকে, সেখানে বিরোধীতাও হয়। আর নবীদের জামা'তের সাথে সব সময় এমনটি হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিরোধিতা আমাদেরকে ভীত এবং ত্রস্ত করতে পারে না। বরং ঈমানকে আরো দৃঢ় করে, ঈমান বৃদ্ধির কারন হয়।

ধরে ডাকবে, তখন তার স্ববংশীয়কে যেভাবে খান বাহাদুর বলবে, অনুরূপভাবে আমার ছেলেকেও খান বাহাদুর বলেই ডাকবে। এই হল অবস্থা, যাদের পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠে না, তারা অন্তত পক্ষে অনুরূপ নাম ধারণের ব্যর্থচেষ্টা করে। কাজেই, তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকেও এক ব্যক্তি ইমাম হওয়ার দাবি করে। (জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কথা হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনের একজন ভাবল, তিনি দাবি করেছেন আর জগতের মানুষ তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করছে, তাই আমিও দাবি করি।) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ফার্সীর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, "প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা-ধারা তার নিজ সাহস এবং অনুমান অনুসারেই হয়ে থাকে।" তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো দাবি করেছেন, আমি সমগ্র বিশ্বের জন্য হাকাম বা ন্যায় বিচারক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কেবল সাধারণ শ্রেণির লোকদের জন্যই নয়, বরং বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌দের জন্যও আমার আনুগত্য করা আবশ্যক। কিন্তু তাঁর আত্মীয়ের নাম রাখাটাই ছিল, বড় বিষয়। তাঁর আত্মীয় দাবি তো করেছেন, কিন্তু সেই দাবি করেছেন, মেথরদের ইমাম হওয়ার। অপর দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করে এটিও লিখে দিয়েছেন যে, ইংল্যান্ড-এর বাদশাহ্‌র জন্যেও আমাকে মানা আবশ্যক। তাই তিনি নিজেই পত্র লিখে রাণীকে পাঠিয়ে দেন। কেননা, তখন ইংল্যান্ডের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন রানী। পক্ষান্তরে মেথরদের ইমাম হওয়ার দাবিকারীর সৎসাহস এবং তার মান্যকারীদের অবস্থা দেখুন। ও.সি. বা থানার পুলিশ কর্মকতা এসে তাকে যখন জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কোন দাবি করেছ? সে বলে, না! আমি তো কোন দাবি করি নি। কেউ হয়তো এমনিতেই মিথ্যা রিপোর্ট করেছে। অতএব, সবচেয়ে কঠোর বিরোধিতা হয়ে থাকে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। (খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯)

তিনি (রা.) বলেন, আত্মীয়-স্বজনরা যখন বিরোধিতা করে, তখন তা চরম আকার ধারণ করে। আর এ জন্য তারা বৈধ-অবৈধ সকল পন্থায় ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে। এ বিষয়টি উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, আমাদের বেশ কয়েক ডজন এমন আত্মীয় রয়েছেন, যারা আহমদীয়াতের কারণে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

এ কারণে নয় যে, আমরা তাদের সাথে মেলামেশা করা পছন্দ করতাম না, বরং তারা আমাদের সাথে মেলামেশা রাখতে চাইত না। আমাদের বংশের মানুষ আমাদেরকে গালি দিত। আমাদের জ্যেঠি-মা, যিনি পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, তিনি আমাদেরকে অনেক আজে-বাজে কথা বলতেন। একবারের কথা আমার মনে আছে, যখন আমার বয়স ছয় বা সাত হবে, তখন আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাচ্ছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবীতে বারবার বলেন, যেমন কাক, তেমনি তার ছানা। আর এ বাক্যটি তিনি এতবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আমি ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এর অর্থ কী? আমাকে জানানো হয়, তোমাকে বলা হয়েছে, তোমার পিতা যেমন খারাপ, তুমিও তেমনই। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কাদিয়ানে বয়কট করা হয়েছে, মানুষকে তাঁর গৃহকর্ম করতে বাধা দেয়া হতো, কুমারদের বাঁধা দেয়া হতো, মেথরদেরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে বাধা দেয়া হতো। আমাদের প্রিয় ভাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর ভাবী এবং অন্যান্য প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, এমনকি তাঁর মামাত ভাই আলী শের, তারা বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিত। তিনি বলেন, একবার গুজরাটের কিছু বন্ধু, যারা সাত ভাই ছিলেন, তারা কাদিয়ান আসেন এবং বাগানের দিকে এ জন্য যান যে, বাগানটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বলে আখ্যায়িত হতো। অর্থাৎ, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পথিমধ্যে আমাদের এক আত্মীয় বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি (অর্থাৎ, আত্মীয়টি) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এসেছ এবং কী উদ্দেশ্যে এসেছ? গুজরাট থেকে আগত অতিথিরা বলেন, গুজরাট থেকে এসেছি আর হযরত মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি।

তিনি বলেন, দেখ! আমি তাঁর মামাত ভাই, আমি খুব ভাল করে জানি যে, সে কেমনতর মানুষ। তাদের একজন, যিনি সবার সামনে ছিলেন, তিনি আরো এগিয়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরেন এবং (অন্য) ভাইদেরকে তাড়াতাড়ি আসার জন্য ডাকতে থাকেন। এর ফলে সেই ব্যক্তি ভয় পেয়ে যায়। তখন সেই আহমদী বলেন, আমি তোমাকে মারব না, কারণ তুমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয়। আমি আমার ভাইদেরকে তোমার চেহারা দেখাতে চাই। কেননা, আমরা শুনতাম যে, শয়তান দেখা যায় না, কিন্তু আজকে আমি স্বচক্ষে দেখছি, সে এমন হয়। (দৈনিক আল ফযল, ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫, ২৩তম খণ্ড, সংখ্যা ১৩২, পৃ. ৩, ৪)

এরপর তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানানো হয়েছে যে, তুমি ছাড়া এ বংশের বাকি সবার বংশের ধারা কর্তিত হবে। (বিরোধিতা এবং যথাসম্ভব সবকিছুই করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন, এই বংশধারা তোমার মাধ্যমেই চালু থাকবে আর বাকি সবার বংশের ধারা

কর্তিত হবে।) এমনই হয়েছে। এই বংশের এখন কেবল তারাই অবশিষ্ট আছেন, যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। বাকি সবার বংশের ধারা কর্তিত হয়েছে। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেন, তখন এই বংশে প্রায় ৭০ জন পুরুষ সদস্য ছিলেন। কিন্তু এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৈহিক বা আধ্যাত্মিক সন্তানরা ছাড়া বাকি ৭০জনের একজনেরও কোন সন্তান নেই। যদিও তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম মুছে ফেলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন আর নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছে? ফলাফল হল, তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন এবং তাদের বংশের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক অসাধারণ প্রমাণ। (খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯)

জ্যেঠি-মা সাহেবার বয়আতের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিদর্শন আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হয়। কিন্তু এগুলোর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিনিবেশকারী মানুষের জন্য তাতে এমন অনেক বিষয় থাকে, যা ঈমানকে অনেক সমৃদ্ধ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, এটি আমি গতকালই জানতে পেরেছি। যদিও তা এক ব্যক্তি এবং তার অবস্থা সংক্রান্ত ইলহাম, তথাপি এতে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত আছে। কয়েক বন্ধু বলেছেন, তারা পূর্ব থেকেই জানতেন কিন্তু আমি গতকালই জেনেছি। গতকাল জ্যেঠি-মা সাহেবার মৃত্যুর সময় শেখ ইয়াকূব আলী সাহেব বলেছেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরোনো একটি ইলহাম আছে আর তা হল, 'তাঈ আঈ'। অর্থাৎ, জ্যেঠি-মা এসেছেন। [তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জ্যেঠি-মা ছিলেন। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় ভাইয়ের স্ত্রী।

অতএব, তিনি (রা.) বলেন, 'তাঈ আঈ' একটি পুরোনো ইলহাম।] এ সম্পর্কে প্রবীণ আহমদীরা বলেন, তখন এর অর্থ বোঝা কঠিন ছিল। কেউ এক অর্থ করত, আবার অন্য কেউ আরেক অর্থ করত। কিন্তু এ বাক্যের সোজা সরল অর্থ হবে, এমন কোন মহিলা, যার সাথে জ্যেঠি-মার সম্পর্ক থাকবে, তিনি আসবেন। আসার দুটি অর্থ থাকতে পারে, কাছে আসা বা জামা'তভুক্ত হওয়া। শুধু আসা কোন ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারে না। কেননা, আত্মীয়-স্বজন তো এসেই থাকে। আমাদের এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ সবাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবীকে জ্যেঠি-মা বলেই ডাকতেন, যেন তার নামই ছিল জ্যেঠি-মা। যারা জামা'তের বই-পুস্তক পাঠ করে, তারা জানে মোহাম্মদী বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যুগে তিনি ভীষণ বিরোধী ছিলেন। (অর্থাৎ, এই জ্যেঠি-মা সাহেবা ভীষণ বিরোধী ছিলেন।) যেহেতু তিনি তার বংশে সবার বড় ছিলেন আর ভবিষ্যদ্বাণীও তার বোনের কন্যা সংক্রান্ত ছিল, তাই বংশের নেতা হওয়ার সুবাদে এই সম্পর্কের পথে বাদ সাধা নিজের জন্য তখন আবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করতেন। কেননা, তিনি এটিকে তার বংশের সম্মান হানির কারণ মনে করছিলেন। তার দৃষ্টিতে বিরোধিতা করাটা ছিল তার গুরুদায়িত্ব।

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নারীর প্রকৃতিতে বড় মহিলার জন্য সম্মান এবং পারিবারিক মর্যাদাকে সকল ধর্মীয় বিষয়, বরং সমস্ত রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অবস্থার তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তার (অর্থাৎ, জ্যেঠি-মার) নিকট তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মসীহ্ হওয়ার দাবি ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যতটা ছিল পারিবারিক সম্মান। এমনিতেও যেহেতু জ্যাষ্ঠদের জন্য ছোটদের আনুগত্য করা কঠিন আর মসীহ্ মওউদ (আ.) জ্যেঠি-মা সাহেবার ছোট ছিলেন এবং সম্পত্তির অংশও নেন নি। [অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পত্তির অংশও নেন নি।] তাই তাঁর পানাহারের ব্যবস্থাও তারই ঘর থেকে হতো (অর্থাৎ, জ্যেঠি-মার ঘর থেকেই খাবার আসতো।) এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি মনে করতেন যে, তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর অনুগ্রহ করছেন। মহিলাদের ভিতর প্রকৃতিগতভাবেই এমন ধ্যান-ধারণা নিহিত থাকে, তাই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তার কাছে 'অনুগ্রহ প্রত্যাশী' মনে করতেন। [তিনি (আ.) সম্পত্তি নেন নি আর সম্পত্তি সব তারই কাছে- এ জন্য তিনি এমন চিন্তা করতেন না, বরং তিনি ভাবতেন, আমি খাবার পাঠাই, খাবার খাওয়াই এবং ব্যয়ভার বহন করি, তাই তাঁকে তিনি তার অনুগ্রহ প্রত্যাশী এবং নিজেকে অনুগ্রহকারী মনে করতেন।] হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একটি আরবী কবিতায় লিখেছেন,

আলজেরিয়াতেও সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীদের উপর অনেক জোর-যুলুম এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন হচ্ছে। খোদা তা'লা তাদেরকেও নিরাপদ রাখুন এবং দৃঢ়তা দান করুন। সেখানকার সরকারকেও আল্লাহ্ তা'লা কান্ডজ্ঞান দিন। তারাও যেন আহমদীদের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে যে, এরা শান্তিপ্রিয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

لُقَاظَاتُ الْمَوَائِدِ كَانَ اَكْلِيْ
وَ صِرْتُ الْيَوْمَ مِطْعَامَ الْاَهَالِيْ

এর অর্থ হল, এক যুগ ছিল, যখন আমি অন্যদের পরিত্যক্ত রুটির টুকরো খেয়ে দিনাতিপাত করতাম, কিন্তু খোদা তা'লা এখন আমাকে এমন মহিমায় মহিমান্বিত করে দিয়েছেন যে, সহস্র-সহস্র মানুষ আমার দস্তরখানে এখন পেটপুরে খায়।

এই পঙক্তিতে এ ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পত্তি ভাগ-বণ্টন করা ছিল না, বরং ভাই-এর কাছেই ছিল আর তাঁর ভিতর তা তদারকির কোন মনোবৃত্তিও ছিল না। তাঁর পিতাও বলতেন, তিনি সম্পত্তি শামলাতে পারবেন না। এমতাবস্থায় শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি-মার ঈমান আনা অনেক কঠিন বিষয় ছিল (কিন্তু পরে তিনি বয়আত করেছিলেন)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা) বলেন, যুক্তি-প্রমাণ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। উভয়ের অবস্থান মালিক ও চাকরের ন্যায় ছিল। [অর্থাৎ, শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি-মা নিজেকে মালিক মনে করতেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নাউযুবিল্লাহ্ চাকর মনে করতেন।] তিনি তাঁকে দরিদ্র এক মানুষ মনে করতেন, যিনি কোন কাজ করতেন না আর তাদের দেয়া খাবার খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। এমতাবস্থায় তিনি তার বোনের মেয়ের সাথে বিয়ে করতে সফল হবেন, এটি তার জন্য ছিল অসহ্য। আবার যেহেতু তিনি সবচেয়ে বড় ছিলেন, তাই তার বিরোধিতা ছিল বিশেষ মাত্রার। সেই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভয়াবহ বিরোধিতা ছিল। আত্মীয়-স্বজন তাঁর সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিল আর তিনিও তাদের সাথে মেলামেশা রাখতেন না। বরং বংশের সদস্যদের বিরোধিতার চিত্র এমন ছিল যে, আমার শ্রদ্ধেয় মা, হযরত আম্মাজান (রা.) বলতেন, হযরত সাহেবের নানার বংশে এক প্রবীণ মহিলা ছিলেন। তিনি বলতেন, আমাকে কেউ চেরাগ বিবির ছেলেকে দেখতেও দেয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চোর এবং ডাকাতদের মত পৃথক রাখা হত। কেননা, মনে করা হতো, তিনি বংশের জন্য কলঙ্ক বিশেষ। এমতাবস্থায় জ্যেঠি-মার আহমদীয়াত গ্রহণের ধারণা করাটা ছিল, বাহ্যত এক অসম্ভব বিষয়। মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু দেখার বিষয় হল, পরিস্থিতি কেমন ছিল? এমন পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি ইলহাম হয়, 'জ্যেঠি-মা এসেছেন'। শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি-মা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবী ছিলেন। তাই এই শব্দগুলোর এ অর্থ ছিল যে, তিনি বয়আত করবেন তখন, যখন বয়আতকারীর সাথে তার সম্পর্ক হবে জ্যেঠি-মার। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে যদি বয়আত করার থাকত, তাহলে ইলহামের শব্দ হতো 'ভাবী এসেছেন'। যেহেতু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবী ছিলেন, তাই 'ভাবী এসেছেন'-এ ইলহামই হওয়া উচিত ছিল। আর যদি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করার থাকত, তাহলে ইলহাম হতো মসীহ্ মওউদের 'বংশের এক মহিলা এসেছেন'।

কিন্তু 'জ্যেঠি-মা' শব্দটি বলছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র যখন তাঁর খলীফা হবেন, তখন তাঁর হাতে তিনি বয়আত করবেন। কেননা, তাঁর সন্তানদের কারো যদি খলীফা না হওয়ারই থাকত, তাহলে 'জ্যেঠি-মা' শব্দ বৃথা সাব্যস্ত হতো। তিনি বলেন, এই ইলহামে সত্যিকার অর্থে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত আছে। প্রধানত: হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তানদের মাঝে কেউ খলীফা হবেন, দ্বিতীয়ত: ঐ সময় শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি-মা আহমদীয়াত গ্রহণ করবেন আর তৃতীয়ত: শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি-মা'র বয়স সংক্রান্ত ইলহাম এটি। আর এটা এভাবে পূর্ণতা লাভ করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের বয়স যখন প্রায় ৭০ বছর, তখন এমন এক ভদ্রমহিলা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, যিনি তখনই বয়সে তার চেয়ে বড় ছিলেন, তথাপি তিনি জীবিত থাকবেন এবং তাঁর বংশ থেকে এক খলীফা হবে, যার হাতে তিনি বয়আত করবেন। এত দীর্ঘ জীবন লাভ করা অনেক বড় কথা। মানবীয় চিন্তাধারা কোন যুবক সম্পর্কেও বলতে পারে না যে, সে এত দিন জীবিত থাকবে, তবে বৃদ্ধা সম্পর্কে কিভাবে বলা যেতে পারে? (শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি-মা সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্তেকাল করেন।) অতএব, এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন। যেন তার বয়আত করা আর আমার যুগে বয়আত করা আর মসীহ্ মওউদের পুত্রদের মধ্য থেকে কারো খলীফা হওয়া, এরূপ বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী যেন এই দুটি শব্দের মাঝে তুলে ধরা হয়েছে।" জ্যেঠি-মা আহমদীয়ত গ্রহণের পর ওসীয়্যতও করেছিলেন। আর এর পটভূমিও বিস্ময়কর। তিনি বলেন, "আমি মনে করি, ঐতিহ্য এবং আবেগ অনুভূতি পুরোনো পরিবারগুলোতে যেমন পাওয়া যায়, সেই দৃষ্টিকোন থেকে এটি এক অসাধারণ পরিবর্তন যে, শ্রদ্ধেয়া জ্যেঠি-মা বয়আত করার পর ওসীয়্যতও করেছেন। (শুধু বয়াআতই করেন নি, বরং ওসীয়্যতও করেছেন।) মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পৈত্রিক কবরস্থানের পরিবর্তে অন্যত্র দাফন করার বিষয়ে প্রথমে তিনি বিরোধী ছিলেন। আর তখন তিনি সংবাদ পাঠান, তাঁকে যেন পৈত্রিক কবরস্থানের পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে দাফন করা না হয়।

কেননা, এটি এক ধরণের অসম্মান। আর এরপরও বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি এ সম্পর্কে আপত্তি করে বেড়াতেন। কিন্তু তার নিজের অবস্থা দেখুন! পরে তিনি নিজেই ওসীয়্যত করেন এবং বেহেশতী মাকবেরায় দাফন হোন। একজন বিবেকবান মানুষের জন্য এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন। আপাত দৃষ্টিতে এটি তুচ্ছ একটি বিষয়, যা এক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এতে ইলহামের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার মত বেশ কিছু দিক অন্তর্নিহিত আছে।" (খুতবাতে মাহমুদ, ১১তম খণ্ড, ২৫১-২৫৩) বিরোধিতা সত্ত্বেও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে তারএই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল যে, তাকে পৈত্রিক কবর স্থানে দাফন করা উচিত। অথচ পরে তিনি নিজেই ওসীয়্যত করেন আর বেহেশতী মাকবেরাতে কবরস্ত হোন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিল্লি সফরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মানুষ যখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, ঐশী কার্যক্রম সম্পর্কে কখনোই সে এ চিন্তা করে না যে, এর ফলাফল প্রকাশ

অপবাদ আরোপ করা হয়, আহমদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বা এরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় অথচ সারা পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন আহমদী কখনো দেশীয় আইনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। বরং আমরা প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রচার ও প্রসার করি। হ্যাঁ, এর জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তবে তাও করব, ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

পাবে না। (নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ছিল যে, আল্লাহ্‌ তা'লা এর উত্তম ফলাফল প্রকাশ করবেন।) তিনি বলেন, হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) যখন দিল্লি এসেছিলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম। [তিনি (রা.) দিল্লির জামা'তকে সম্বোধন করে বক্তৃতাকালে এ কথাগুলো বলছিলেন] হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এখানকার ওলী-আওলিয়াদের মাজারে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করেন আর বলেন, আমার এ দোয়া করার কারণ হল, এসব বুযুর্গের আত্মা যেন উদ্বেলিত হয়। আর এ যুগে আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের হেদায়াতের জন্য যে নূর বা জ্যোতি প্রেরণ করেছেন, সেই নূর সনাক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের বংশধর বঞ্চিত থেকে যাবে, এমন যেন না হয়। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যখন আল্লাহ্‌ তা'লা এদের হৃদয়কে খুলে দিবেন আর তারা সত্য গ্রহণ করবে। তিনি (রা.) বলেন, তখন যদিও আমি ছোট ছিলাম, কিন্তু হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর এই কথার প্রভাব এখনো আমার হৃদয়ে বিদ্যমান। অতএব, এখানকার জামা'ত যদি নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন ভাল ফলাফল দেখতে চায়, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'লার উপর নির্ভর করা উচিত। যে বিষয়কে আল্লাহ্‌ তা'লা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা হবেই হবে আর এমন একদিন অবশ্যই আসবে।" দিল্লি জামা'তের সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। (জামা'তে আহমদীয়া দিল্লিকে এড্রেস কা জাওয়াব, আনোয়ারুল উলুম, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৮৩-৮৪)

অতএব, আজও দিল্লি জামা'তের জন্য আবশ্যক হবে, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচার করা। মাশাআল্লাহ্‌! প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে তবলীগে অনেক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও রয়েছে। তাই তাদের মাঝেও এই বাণী প্রচারের অনেক বেশি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দোয়া। এদিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।

একই ধারাবাহিকতায় হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ করে আরো বলেন, একটি দীর্ঘ নালা খনন করা আছে এবং তাতে বেশ কিছু ভেড়া শোয়ানো হয়েছে, প্রতিটি ভেড়ার সামনে একজন করে কসাই ছুরি হাতে নিয়ে জবাই-এর জন্য প্রস্তুত আর তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে, যেন তারা কোন নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলছেন, তখন আমি সেখানে পায়চারি করছিলাম, তাদের কাছে গিয়ে আমি বলি

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

(সূরা আল ফুরকান, ৭৮) (অর্থাৎ, তুমি বল, তোমরা দোয়া না করলে আমার প্রভূ-প্রতিপালক তোমাদের মোটেও গ্রাহ্য করবেন না।) আর তখনই তারা ছুরি চালিয়ে দেয়। সেই ভেড়াগুলো যখন ছটফট করছিল, তখন যারা ছুরি চালিয়েছিল তারা বলে, তোমরা মল ভক্ষণকারী ভেড়া ছাড়া আর কিছুই তো নও। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সেই দিনগুলোতে সত্তর হাজার মানুষ কলেরায় প্রাণ হারায়। অতএব, কেউ যদি কর্ণপাত না করে, তবে আল্লাহ্‌ তা'লা তার তোয়াক্কা করেন না আর তাঁর কাজ ব্যহত হতে পারে না, তা হবেই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।" তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিনশত বছর পর খ্রিষ্টধর্ম উন্নতি করে, কিন্তু আমাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, ঈসা নবীর যুগের অনেক পূর্বেই আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্‌। (জামা'তে আহমদীয়া দিল্লিকে এড্রেস কা জাওয়াব, আনোয়ারুল উলুম, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৮৪)

পাকিস্তানী মৌলবী, কোন ধর্মীয় নেতা বা জাগতিক কোন শক্তিই হোক না কেন, খোদার দৃষ্টিতে এদের কোনই মূল্য নেই। এরা তো ভেড়ার পালের মত জন-মানব বিশেষ। এরা কখনোই আহমদীয়াতের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারবে না। কাজেই, আহমদীয়তের প্রচার এবং প্রসারের জন্য কেবল আমাদের মুবাল্লেগদের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। নিজে যদি এ উন্নতির ভাগীদার হতে চান, বরং অবশ্যই হওয়া উচিত, তবে দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে হবে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। এ বিষয়গুলোই আহমদীয়াতের বিরোধিতাকেও নির্মূল করার কারণ হবে আর আহমদীয়াতের উন্নতির ক্ষেত্রেও আমাদের অংশীদার বানাবে, ইনশাআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি জনাব সুফনী জাফর আহমদ সাহেবের জানাযা, ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লেগ। গত ৮ নভেম্বর তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৪৫ সনের ১৮ আগষ্ট সুমাত্রার পাডাং-এ তার জন্ম হয়। তার পিতা জেনি দালান সাহেব ১৯২৩ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তিনি আরো দুইজন যুবকের সাথে সম্মিলিতভাবে সুমাত্রা এবং জাভায় তবলিগী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে সুফনী সাহেবের পিতা ইন্দোনেশিয়ার প্রথম যুগের মুবাল্লেগদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। জেনি দালান সাহেবের তিন সন্তান ছিল। সুফনি জাফর আহমদ সাহেবকে ওয়াক্‌ফ করার পর জ্ঞানার্জনের জন্য জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে পাঠান। সুফনী জাফর আহমদ সাহেব ১৭ জুলাই ১৯৬৩ সনে রাবওয়ায় আসেন এবং প্রায় ১১ বছর রাবওয়াতে অবস্থান করে জামেয়া আহমদীয়াতে লেখাপড়া করেন। ১৯৭৪ সনে লেখাপড়া শেষ করে ইন্দোনেশিয়া ফিরে যান। আর ইন্দোনেশিয়ার কালিমানটানে তার প্রথম পোষ্টিং হয়। এরপর তিনি পশ্চিম জাভায় আঞ্চলিক মুবাল্লেগ ও আমীর হিসেবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক পান। পরে পূর্ব জাভা এবং পাপওয়াতে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৯৮৫ থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত জাম্বিতে, ১৯৮৭ থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত উত্তর সুমাত্রায় আঞ্চলিক মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়াতে ফিকাহর শিক্ষক হিসেবে ফিকাহ পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময় তরবিয়ত নও মোবাঈন বিভাগের দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত লাম্পুঙ্গ-এ আঞ্চলিক মুবাল্লেগ নিযুক্ত হন। তার মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি মসজিদ এবং মিশন হাউসের নির্মাণের কাজও তিনি করেন। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় নিম্নলিখিত চারটি পুস্তিকা লেখার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। যাকাতের দর্শন, আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকার, জানাযা এবং ইসলামে জিহাদের অর্থ। এই চারটি পুস্তক তিনি লিখেছেন। ২০০১ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিছু দিন থেকে তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। জামা'তের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এক সেবক ছিলেন। পরিবার-পরিজনে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা এবং দুই পুত্র তিনি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। পিতার মত পুণ্যে অগ্রগামী, বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী এবং আমলের দিক থেকেও উন্নত আহমদীতে পরিণত করুন।

(আল ফযল ইন্টান্যাশনাল, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬)

কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন, সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি, কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাই-বা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

জুমুআর খুতবা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাতুল্লিল আলামীন

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল, আমরা ইসলামী মাস রবিউল আউয়াল অতিবাহিত করছি। যদিও সমগ্র ইসলামী বিশ্বেই এ মাসের গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু পাক-ভারতে এর বিশেষ গুরুত্বের কারণ হল, এতদঞ্চলে এ মাসটি মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। কেননা, এ মাসের ১২ তারিখে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে, একটি গবেষণা থেকে এটি বলা হয়। কিন্তু হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'সীরাতে খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকে এটিও লিখেছেন যে, মিশরীয় একজন পণ্ডিতের গবেষণা অনুসারে ০৯ রবিউল আউয়াল রসূলে করীম (সা.)-এর জন্ম গ্রহণ করেছেন। [সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. (রা.), পৃ. ৯৩]

যাহোক 'রবিউল আউয়াল' সেই মাস যে মাসে আমাদের মনিব এবং মহামান্য নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয় কেননা, তারা এ দিনটি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুগ্রহকারী রসূল (সা.)-এর জন্মদিবস উপলক্ষে উদ্‌যাপন করলেও তারা নিজেরাই 'কুলুবুহুম শাত্তা' (সূরা আল্-হাশর: ১৫) অর্থাৎ, তাদের হৃদয় বহুধা বিভক্ত- উক্তির সত্যায়নস্থলে পরিণত হয়ে আছে। আল্লাহ্

'রবিউল আউয়াল' সেই মাস যে মাসে আমাদের মনিব এবং মহামান্য নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে আক্ষেপ হয় কেননা, তারা এ দিনটি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুগ্রহকারী রসূল (সা.)-এর জন্মদিবস উপলক্ষে উদ্‌যাপন করলেও তারা নিজেরাই 'কুলুবুহুম শাত্তা' (সূরা আল্-হাশর: ১৫) অর্থাৎ, তাদের হৃদয় বহুধা বিভক্ত- উক্তির সত্যায়নস্থলে পরিণত হয়ে আছে।

তা'লা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডির যে বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন তাহল, 'রুহামাউ বাইনাহুম' (সূরা আল্-ফাতাহ্: ৩০) অর্থাৎ, তারা পরস্পরের প্রতি অতীব দয়ার্দ্র। অথচ দয়া প্রদর্শন তো দূরের কথা, এদের অধিকাংশই পরস্পরের রক্ত পিপাসু। প্রতিদিন সংবাদ আসে যে, শত শত মুসলমান মুসলমানদেরই হাতে নিহত হচ্ছে। আর এই বিষয়টি এমন, যা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তারা যদি নিজেদের মাঝে অন্যায়-অত্যাচার করে বেড়ায়, তাহলে করুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এসবই হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নামে। মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে। সেই খোদা, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যিনি রহমান, রহীম আর সেই রসূল (সা.), যিনি 'রহমাতুল্লিল আলামীন', তাঁদের নামে অন্যায়, অবিচার আর বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অসহায় নারী, শিশু এবং নিষ্পাপ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে, বস্ত্রহীন অবস্থায় এবং অনাহারে তাদেরকে জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এক কথায়, ধৃষ্টতার সাথে নির্লজ্জতার বেশাতি করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর নামে এ সব চাপানো হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করা তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। নিরপরাধ কোন মানুষকে হত্যা করলে জাহান্নামের অগ্নি এড়াতে পারবে না। কিন্তু ধর্মের ঠিকাদার ও স্বার্থপর এই নেতারা অতি সরল এবং স্বল্পজ্ঞানী মুসলমানদেরকে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে এমন হীন কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। ইসলামকে এরা এতটাই দুর্নাম করছে যে, আজ অ-মুসলিম বিশ্বে ইসলামের নাম শুনলেই প্রথমে তাদের মাথায় যে চিত্র আসে, তাহল নিপীড়ন, নির্যাতন এবং বর্বরতা। অবশ্য একটি ক্ষেত্রে এসব নামধারী মুসলমান নেতারা সমবেত হয়ে পরস্পরের সাথে সহযোগিতার আলোচনা ও নসীহত করে থাকে আর তা হল, সেই বিষয়, যার বিরুদ্ধে খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) সুস্পষ্ট আদেশ জারী করে রেখেছেন।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের অবস্থা যখন এমন হবে, মুসলমানদের হৃদয় যখন এভাবে বহুধা বিভক্ত হবে, 'কুলুবুহুম শাত্তা' (সূরা আল্-হাশর: ১৫)-এর অবস্থা হবে, মুসলমানরা যখন পরস্পরকে জবাই করবে আর নামধারী আলেমদের কাছে হিদায়াতের জন্য যাবে, যাদের সম্পর্কে এদের ধারণা যে, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত, কিন্তু তারা সেই সকল আলেমদেরকে এমন অপকর্মে লিপ্ত পাবে, যেসব অপকর্ম মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। বরং সাধারণ আলেমদের চেয়েও তাদের অবস্থা হবে নিকৃষ্ট।

মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'উলামাউহুম শাররু মান তাহতা আদিমিস সামাই'। অর্থাৎ, তাদের আলেম সমাজ আকাশের নিচে বসবাসকারী সকল সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে। (আল জামেয়ু লেশেবেল ঈমানে লিলবাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩১৮) কিন্তু কেন? তিনি (সা.) বলেন, এর কারণ হল, এরা নৈরাজ্যবাদী আলেম আর এদেরই মধ্য থেকে নৈরাজ্যের সূচনা হবে। আর আজ আমরা আলেমদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মাঝে এটিই দেখতে পাচ্ছি। আগুন নিভানোর পরিবর্তে এরা আগুন লাগিয়ে থাকে। অতএব, তিনি (সা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেছেন, ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে দরদ রাখে, এমন মুসলমানরা যেন এহেন পরিস্থিতিতে নিরাশ না হয়। কেননা, এমন সময়ে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী আসবেন, যিনি তার মনিব এবং মহামান্য নেতার পূর্ণ অনুগত দাস হিসেবে মুসলিম এবং অ-মুসলিম সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন আর ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও সমুজ্জল শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করবেন এবং মুসলমানদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন। কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এ সব আলেম [মহানবী (সা.)-এর] এ কথা অস্বীকার করে আর সাধারণ মানুষও সাধারণ মুসলমাদেরকে ভ্রান্ত কথা বলে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। এভাবে তারা মানুষের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদেরকে তারা এমন সব কথা বলে, যার কোন অস্তিত্বই নেই।

সব মুসলমানের এই বিশ্বাস রয়েছে আর এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন মুসলিম মুসলমানই গণ্য হতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নাবীঈন এবং শরীয়ত তাঁর সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী এসব মৌলভী সাধারণ মুসলমানদেরকে এই কথা বলে উত্তেজিত

করে তুলে যে, আহমদীরা খতমে নবুয়্যতের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। এর জন্য 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়ে 'লানাতাল্লাহে আলাল কাযেবীন' বলা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। যে ব্যক্তি আহমদী আখ্যায়িত হয়েও এই কথায় বিশ্বাস রাখে না যে, রসূলে করীম (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সে অবাধ্য, বিদ্রোহী, অনাচারী, দুরাচারী এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত। আর এমন ব্যক্তির সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কোন সম্পর্ক বা সংস্রব নেই। হ্যাঁ! এ কথা সত্য যে, আহমদীরা 'খতমে নবুয়্যত'-এর সেই অর্থ করে, যা স্বয়ং মহানবী (সা.) করেছেন আর কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা সে বিষয়ই বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব এবং তাঁর শরীয়তের গন্ডী বহির্ভূত হয়ে এখন কোন নবীই আর আসতে পারবে না।

একবার মহানবী (সা.) বলেছেন, আবু বকর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তবে হ্যাঁ! কোন নবী আগমন ঘটলে তবে তা ভিন্ন কথা। (কুনযুল উম্মাল, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৫১, কিতাবুল ফাযায়েলে যিকরে সাহাবা ওয়া ফাযলেহিম, হাদীস নম্বর ৩২৫৭৫, মুদ্রণ-দারুল কুতুবুল আলামিয়া, বৈরুত ২০০৪ইং)

অতএব, তিনি (সা.) নবুয়্যতের পথ বন্ধ করেন নি। তবে (এ কথা সঠিক যে,) তাঁর (সা.) গণ্ডির বাহিরে থেকে কেউ আসতে পারে না এবং নতুন কোন শরীয়তও অবতীর্ণ হতে পারে না। আর আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে যে মসীহ্ও মাহদী হিসেবে নবীরূপে মান্য করি, তা তাঁর (সা.) পূর্ণ দাসত্বের গণ্ডির মাঝে রেখেই সে বিশ্বাস রাখি। আর পুরোনো আলেমদেরও একই বিশ্বাস ছিল।

যেমন, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ দেহলভী 'তফহীমাতে ইলাহিয়া' পুস্তকে লিখেন, "আমার সত্তায় নবুয়্যত সমাপ্ত করা হয়েছে [মহানবী (সা.)-এর এ কথা]-এর অর্থ কেবল এটি নয় যে, এমন কোন ব্যক্তি আসবে না, যাকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য শরীয়ত সহকারে পাঠাবেন। (আত তাফহিমাতে ইলাহিয়া, রচয়িতা, শাহ্ ওলী উল্লাহ্ হেদলভী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫, মাকতুবা হায়দারী লাহোর, ১৯৬৭ইং) বরং এর অর্থ হল, শরীয়তসহ কোন নবী আসবে না, কিন্তু শরীয়ত বিহীন আসতে পারে।

অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামুল আম্বীয়া অবশ্যই বল কিন্তু এ কথা বলো না যে, তাঁর পর কোন নবী নেই। (আদ্ দুররে মানসুর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪, তফসীর সূরা আহযাব, মুদ্রণ- দারুল মা'রেফা, বৈরুত)

অতএব, আমরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ মওউদ মেনে নবীর যে মর্যাদা দিয়ে থাকি, তা দিয়ে থাকি রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি তার দাসত্ব বরণের কল্যাণে। অতএব, বিভিন্ন সময় আলেমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে স্পর্শকাতর এই কথা বলে ক্ষেপিয়ে তুলে যে, কাদিয়ানীরা মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে নবী মানে, অথচ তাদের এই কথাগুলো নৈরাজ্য বা অশান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাকিস্তান সরকার এটি নিয়ে গর্ব করে যে, তারা তখন আইন পাশ করে খতমে নবুয়্যত সংক্রান্ত নব্বই বছর পুরোনো সমস্যাটির সমাধান করেছে। আর এখন তো ১২৫ বছর কেটে গেছে। আর এ বিষয়ে পাকিস্তানের আলেম সমাজ এবং কোন কোন সরকারী কর্মকর্তাও সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলে। এটি তাদের সেই অবস্থা, যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাদের এসব আলেমের কথা না শুনে সাধারণ মুসলমানদের এটি তলিয়ে দেখা উচিত যে, বর্তমান যুগ কি এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে না, যার সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যিনি এসে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন? নিঃসন্দেহে এটিই সেই যুগ, আর খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এ সব তাদের আলেমরা মানবে না। কেননা, মিম্বর তাদের হাত ছাড়া হবে এবং তাদের রুটি-রুজিও বন্ধ হয়ে যাবে। এরাই মুসলমানদেরকে ক্ষেপাতে থাকবে। আর যেমনটি আমি বলেছি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আইনও তাদেরকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। তাই এই অপবাদের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন সময়ে মিছিল, সমাবেশ এবং কটু ভাষায় গালিগালাজ করতেই থাকে। তবে এই দুরাচারিতা ও দুরাচরণ ওই মৌলভীদেরই সাজে। তারা এমনটি করতে পারলেও আহমদীরা এমন অপকর্মের মোকাবিলা করতে পারে না।

> তিনি (সা.) এই অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে বলেছেন, ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে দরদ রাখে, এমন মুসলমানরা যেন এহেন পরিস্থিতিতে নিরাশ না হয়। কেননা, এমন সময়ে মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী আসবেন, যিনি তার মনিব এবং মহামান্য নেতার পূর্ণ অনুগত দাস হিসেবে মুসলিম এবং অ-মুসলিম সকলকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন আর ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দরও সমুজ্জল শিক্ষা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করবেন এবং মুসলমানদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করবেন।

১২ রবিউল আউয়ালের প্রেক্ষাপটে রসূলের সম্মান এবং খতমে নবুয়্যতের নামে

কয়েকদিন (চারদিন) পূর্বে পাকিস্তানের দুলমিয়ালে কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক এবং মৌলভীরা সমবেত হয়ে মিছিল বের করে এবং আমাদের মসজিদে হামলা করে। মসজিদে আহমদীরা ছিল, তারা তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয় নি, দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু পুলিশের কথায় আহমদীরা যখন দরজা খুলে দেয় আর পুলিশের এই নিশ্চয়তা সাপেক্ষে দরজা খোলা হয় যে, তারা মসজিদের হেফাযত করবে, তখন এসব উচ্ছৃঙ্খলের দল মসজিদে ঢুকে পড়ে আর পুলিশ তা দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যায়। এরপর, মসজিদের বিভিন্ন আসবাপত্র বের করে তাতে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের নিজস্ব ধারণামতে ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে বলে তারা আত্মপ্রসাদ নেয়।

যাহোক, আমরা আইনের বিরুদ্ধে যাব না আর যাইও না। ইহজাগতিক উপায়-উপকরণের যতটা সম্পর্ক আছে, সেটির তোয়াক্কা আমরা করি না, তারা ক্ষতি করেছে বটে, তা করুক। কিন্তু আমাদের ঈমান, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ এবং তওহীদ বা একত্ববাদকে হৃদয়ে গ্রথিত ও ধারণ করার যতটা সম্পর্ক আছে, এ জন্য আমরা নিজেদের প্রাণও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এখন থেকে আমরা কিছুতেই পিছু হটব না। আমরা সব সময় এটিই বলে আসছি আর এর জন্য ত্যাগও স্বীকার করে আসছি যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এ ঘোষণা করা থেকে কখনোই আমরা বিরত হব না।

এরা প্রথাগতভাবে একত্রিত হয়ে মিলাদ-মাহফিল করে থাকে। পাকিস্তানে এদের অধিকাংশ বক্তৃতায় আহমদীদেরকে গালিগালাজ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। কিছু সময় ধরে তারা নোংরা কথাবার্তা বলতে থাকে এবং বিষোদগার করে আর মনে করে, এভাবেই তারা ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছে। কিন্তু জামা'তে আহমদীয়া তো ইসলামের সত্যিকার সেবার দায়িত্ব প্রথমবার স্বীয় কাঁধে তখন তুলে নিয়েছে, যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দাবি করেছেন। আর তিনি এটিই বলেছেন যে, তওহীদ বা একত্ববাদ এবং মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি এসেছি। ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুণঃপ্রতিষ্ঠা আমার মাধ্যমেই হবে। আর এরপর আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার যুগে অমুসলিমরা যখন মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে অপালাপ করে এবং অত্যন্ত নোংরা ভাষায় লেখালেখি আরম্ভ করে, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ব্যাপক পরিসরে ভারতবর্ষ জুড়ে 'সীরাত সম্মেলন' আয়োজন করেন। আর তিনি আহমদী এবং অ-আহমদী সকলকেই আহ্বান জানিয়ে বলেন, চলুন! ভেদাভেদ ভুলে এখন সবাই সম্মিলিতভাবে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের সুরক্ষাকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করি আর এভাবে তিনি ব্যাপক পরিসরে এই সম্মেলনের সূচনা করেন। উপরন্তু ভদ্র অমুসলিমদেরকেও তিনি এতে আমন্ত্রণ জানান। মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান রাখা এবং তাঁর সম্মান ও সম্ভ্রমের হিফাযত করা তো মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ সমগ্র বিশ্বে ছেয়ে আছে। সারা বিশ্বের জন্য তিনি আশীর্বাদ, তাই অ-মুসলিম ভদ্র শ্রেণীর মানুষ-জনও যেন তাঁর (সা.) জীবনী বা আচরিত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে। অতএব, শিক্ষিত অনেক অ-মুসলিম রয়েছেন, যাদের মাঝে হিন্দুরাও অন্তর্ভুক্ত, তারা মহানবী (সা.)-এর জীবন-চরিত নিয়ে প্রবন্ধ ও সন্দর্ভ পাঠ করেন। ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে এই সম্মেলন যখন প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেখানে হিন্দু কবিদের রচিত দুটো না'তও পাঠ করা হয়। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩)

যেমনটি আমি বলেছি, সমগ্র ভারত জুড়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর প্রেরণা ও আহ্বানে 'সীরাত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্বাসগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তখন অ-আহমদী আলেম সমাজ, (যদিও তাদের কতক ব্যক্তি এ প্রচারাভিযানের বিরোধিতাও করেছিল, তথাপি) তাদের অনেকেই এমন ছিল, যারা এই পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়েছে। আর পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে এবং অনুষ্ঠানের সংবাদও প্রকাশ করা হয়েছে।

একটি পত্রিকা হল, গৌরকপুর থেকে প্রকাশিত 'মাশরেক'। ১৯২৮ সনের ২১ জুন সংখ্যায় তারা লিখেছে, ভারতবর্ষে এটি একটি অমর ইতিহাস হয়ে থাকবে। কেননা, এই তারিখে কোন না কোন ভাবে মুসলমানদের সকল ফির্কাই সম্মানিত রসূল ও দুই জগতের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতিচারণ করেছে। আর সব শহরই চেষ্টা করেছে, তাদের শহর যেন প্রথম স্থানে থাকে। যারা এসময় ভেদাভেদ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পোষ্টার লিখেছে (কিছু লোক এমনও ছিল যাদের কাজই হল, বিরোধিতা করা।) এবং বক্তৃতা লিখে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছে, (অর্থাৎ, পত্রিকায় পাঠিয়েছে) তারা আসলে চরম আহাম্মক ও নির্বোধ। সংবাদ পরিবেশক বলেন, যারা আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা চরম নির্বোধ। আমাদের বিশ্বাস হল, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-য় বিশ্বাস রাখে, সে সফল ও মুক্তিপ্রাপ্ত। তিনি আরো লিখেন, ১৭ জুন জলসার সফলতার জন্য আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম জনাব মির্যা মাহমুদ আহমদকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যদি শিয়া, সুন্নি এবং আহমদীরা এভাবে বছরে দু'চার বার এক জায়গায় সমবেত হয়, তা হলে কোন অপশক্তিই এ দেশে ইসলামের বিরোধিতায় দাঁড়াতে পারবে না।

আরেকটি পত্রিকার নাম হল- 'সুলতান'। এটি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি একটি বাংলা পত্রিকা। এ পত্রিকার২১ জুন সংখ্যায় লিখা হয়েছে, জামা'তে আহমদীয়া ১৭ জুন তারিখে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী তুলে ধরার জন্য সমগ্র ভারতে সমাবেশ করেছে। আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, প্রায় সর্বত্রই সফল সমাবেশ হয়েছে। আর এটি সত্য কথা যে, এ ক্ষেত্রে আহমদীরা এমন অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো লাভ হয় নি আর এটি থেকে বুঝা যায় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিচ্ছে। আর আমরাও এই শক্তির কথা স্বীকার করি এবং তাদের সাফল্য কামনা করি। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৭-৩৮)

সে সময় পত্র-পত্রিকা এটি লিখেছে আর অ-

সব মুসলমানের এই বিশ্বাস রয়েছে আর এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া কোন মুসলিম মুসলমানই গণ্য হতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নাবীঈন এবং শরীয়ত তাঁর সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী এসব মৌলভী সাধারণ মুসলমানদের এই কথা বলে উত্তেজিত করে তুলে যে, আহমদীরা খতমে নবুয়্যতের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। এর জন্য 'ইন্না লিল্লাহ্' পড়ে 'লানাতাল্লাহে আলাল কাযেবীন' বলা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই।

আহমদী এবং অ-মুসলিমরাও সঙ্গ দিয়েছে। কেননা, এটি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের প্রশ্ন ছিল। কারো পক্ষ থেকে সাধুবাদ নেয়ার প্রয়োজন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নেই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর এই কর্ম-প্রচেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের শত্রু এবং মহানবী (সা.)-কে যারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে, তারা যেন বুঝতে পারে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা কত উচ্চ? আর এটিও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, এ ক্ষেত্রে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ। কাদিয়ানে কতক হিন্দুও রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে বক্তৃতা করেছে। আল্-ফযল পত্রিকা তখন বিশেষ করে খাতামান্নাবীঈন সংখ্যা ছেপেছে। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩) আর তখন থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিয়মিত 'সীরাতুন্নবী জলসা'-র আয়োজন করে আসছে। তিনি যে চার-পাঁচটি পয়েন্ট দিয়েছিলেন সেগুলোর একটি হল, শুধু ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে নয়, বরং সারা বছরই বিভিন্ন সময় 'সীরাতুন্নবী জলসা'অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১)

যাহোক, এই হল জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস। এখনও জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর দুইশতাধিক দেশে, যেখানেই জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এখন কেবল আহমদীরাই রয়েছে এবং থাকবেও ইনশাআল্লাহ্, যারা খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা ও মর্ম বুঝে আর মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করছে। এটি এ জন্য যে, এ যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) আমাদেরকে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে মহানবী (সা.)-এর আঁচল আকড়ে ধর। কেননা, তিনিই এখন মুক্তির একমাত্র পথ, এছাড়া মুক্তির অন্য কোন মাধ্যম নেই। তিনি (আ.) বলেন, 'ওহ্ হ্যাঁয় ম্যায় চিজ কিয়া হু', (অর্থাৎ, তিনিই সব কিছু আমি কিছুই নই)। (কাদিয়ানকে আরিয়া অর হাম, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ.৪৫৬)

তিনি (আ.) নিজেকে কখনো বড় বলেন নি বা বড় বলে দাবি করেন নি। সব সময় মহানবী (সা.)-এর মাহত্ম্যই বর্ণনা করেছেন। আর এই যে অপবাদ রয়েছে যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি না, এর খণ্ডনে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, "এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার এবং আমার জামা'তের প্রতি এই যে অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানি না, এটি আমাদের প্রতি এক ভয়াবহ অপবাদ। আমরা যে ঈমানী শক্তি, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.) কে 'খাতামুল আম্বিয়া' মানি এবং বিশ্বাস পোষণ করি, তার লক্ষ্য ভাগের এক ভাগও অন্যরা মানে না আর তাদের সেই যোগ্যতাও নেই। খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও গূঢ়রহস্য তারা একেবারেই বুঝে না। এরা কেবল নিজেদের পিতা-পিতামহের কাছে একটি শব্দ শুনে রেখেছে, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। আর জানে না যে, খতমে নবুয়্যত কাকে বলে? আর এতে ঈমান আনার অর্থ এবং মর্ম কী? কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে,(যা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন,)মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে বিশ্বাস করি। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম এমনভাবে উন্মুক্ত করেছেন যে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের পানীয়, যা আমাদেরকে পান করানো হয়েছে, তা থেকে আমরা একটি বিশেষ স্বাদ পাই, যার ধারণা তারা ব্যতীত অন্যরা কখনোই লাভ করতে পারে না, যারা এই প্রস্রবণ থেকে পান করে পরিতৃপ্ত হয়।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)

অতএব, আমাদেরকে যারা খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী মনে করে, তারা নিজেরা অন্ধ, তাদের হৃদয় অন্তঃসার-শূণ্য। কেবল জিগির-বাজি আর নৈরাজ্য ও ভাঙ্গচুর করা ছাড়া তাদের কাছে আর কী-বা আছে? আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এখন ইসলামের যে বাণী বিশ্বময় প্রচার করে চলেছে, তা কি এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতের জন্য কৃত দোয়া থেকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তই অংশ পাচ্ছে।

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে সেই নবী (সা.) দিয়েছেন, যিনি খাতামুল মু'মিনীন, যিনি খাতামুল আ'রেফীন এবং খাতামুন্নাবীঈন। অনুরূপভাবে সেই গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ণতম গ্রন্থ এবং

সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রসূলুল্লাহ্(সা.), যিনি খাতামুন্নাবীঈন, তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নবুয়্যত এভাবে সমাপ্ত হয় নি, যেভাবে কেউ কাউকে গলা টিপে হত্যা করে। এভাবে শেষ হওয়া প্রশংসার কারণ নয়। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের সমাপ্তির অর্থ হল, সহজাত বা প্রকৃতগত ভাবে তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের বৈশিষ্টাবলী চরম ও পরম মার্গে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব, যা আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত সকল নবীদেরকে দেয়া হয়েছে, কাউকে কোনটি, অন্য কাউকে আবার অন্য কোনটি, কিন্তু এর পুরোটাই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিগত ভাবে তিনি খাতামুন্নাবীঈন সাব্যস্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে, সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা, নসীহত এবং তত্ত্বজ্ঞান, যা বিভিন্ন পুস্তকে চলে আসছে, তা পবিত্র কুরআনের মাঝে পূর্ণতার পরম রূপ পেয়েছে আর এভাবে কুরআন খাতামুল কুতুব গণ্য হল।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৪২, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)

পুনরায়, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে চিরঞ্জীব রসূল, এ আঙ্গিকে মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "বনী ইসরাঈলের অবশিষ্ট ইহুদিই হোক বা হযরত ঈসা (আ.) কে খোদা মান্যকারী খ্রিস্টানই হোক, তাদের মাঝে এমন কেউ কি আছে, যে এ সমস্ত নিদর্শনের ক্ষেত্রে আমার মোকাবিলা করতে পারে। আমি ঘোষণা দিয়ে বলছি যে, একজনও নেই। এটি আমাদের মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনেরই প্রমাণ। কেননা, এটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, মহামান্য নবীর কোন অনুসারীর মাধ্যমে যে সমস্ত নিদর্শন প্রদর্শিত হয়, তা সেই নবীর নিদর্শন বলেই গণ্য হয়। অতএব, যে সমস্ত অলৌকিক নির্দশনাবলী আমাকে দেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর যে সমস্ত অসাধারণ নিদর্শন আমার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা আসলে মহানবী (সা.)-এরই জীবন্ত নিদর্শন। অন্য কোন নবীর অনুসারী আজ এটি নিয়ে গর্ব করতে পারবে না যে, সে-ও তার নিজের মাঝে মহামান্য নবীর আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারে। এই গর্ব শুধুই ইসলামের। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়,চিরঞ্জীব রসূল শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই হতে পারেন, যার পবিত্র নিঃশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে সকল যুগে খোদা প্রেমি এক ব্যক্তি খোদাকে দর্শন করানোর প্রমাণ দিতে থাকে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩-৪১৪, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)

মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা এবং সম্মান, তাঁর বিনয় আর খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য তাঁর ভালোবাসায় বিলীন হওয়া সম্পর্কে খোদার উক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় বলেন, "হাদীসে এসেছে, যদি ফযল এবং কৃপা লাভ না হয়, তাহলে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। (খোদার কৃপাগুণেই মুক্তি লাভ হয়।) অনুরূপভাবে, হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) [মহানবী (সা.)-কে একবার জিজ্ঞেস করেছেন যে,] হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনারও কী একই অবস্থা? [অর্থাৎ,তিনি (সা.) এই যে বলেছেন, খোদার কৃপা লাভ না হলে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আপনার ক্ষেত্রেও কী এটি সত্য?] রসূল করীম (সা.) মাথায় হাত রাখেন এবং বলেন, হ্যাঁ।" তিনি (আ.) বলেন, "এটি ছিল খোদার প্রতি মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ দাসত্বেরই বহিঃপ্রকাশ, যা খোদা তা'লার রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে আকর্ষণ করছিল।" এরপর তিনি বলেন, "আমরা স্বয়ং এটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বার বার পরীক্ষা করেছি, আর সব সময় এটিই দেখি যে, বিনয় এবং নম্রতা যখন পরম মার্গে পৌঁছে এবং আমাদের আত্মা যখন এই দাসত্ব ও বিনয়ে বিগলিত হয় আর খোদা তা'লার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছে, তখন উর্ধ্বলোক থেকে এক জ্যোতি এবং আলো অবতীর্ণ হয় আর এমন মনে হয়, যেন একটি নলের মাধ্যমে স্বচ্ছ পানি অপর একটি নলে প্রবেশ করে। অতএব,মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে বিনয় এবং নম্রতায় পরম মার্গে উপনীত যতটা মনে হয়, সেখানে এটি বুঝা যায় যে, তিনি (সা.) রুহুল কুদুসের সাহায্যে ততটাই সাহায্যপুষ্ট এবং আলোয় আলোকিত, যেমনটি আমাদের মহানবী (সা.) কার্যত এবং ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শন করেছেন। এমন কি তিনি (সা.)-এর জ্যোতি এবং কল্যাণের গণ্ডি এতটা বিস্তৃত যে, এর দৃষ্টান্ত এবং প্রতিচ্ছবি অনন্তকাল পর্যন্ত দেখা যায়। কাজেই, এ যুগে খোদা তা'লার যত কল্যাণরাজী এবং কৃপাবারি বর্ষিত হচ্ছে, তা তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর অনুসরণের কল্যাণেই লাভ হয়।" তিনি বলেন, "আমি সত্যই বলছি,মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান ও খোদার সন্তুষ্টি-ভাজন গণ্য হতে পারে না আর সেই সকল নিয়ামত, কল্যাণরাজি, তত্ত্বজ্ঞান এবং দিব্য-দর্শনে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে না, যা অতি উচ্চ পর্যায়ের আত্মশুদ্ধির স্তরে লাভ হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার কিতাবেই এর প্রমাণ দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কুল ইন কুন্তুম তুহিব্বুনাল্লাহি ফাত্তাবিউনি ইউহবিবকুমুল্লাহ্' (সূরা আলে ইমরান: ৩২) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩-২০৪, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)অর্থাৎ,যদি খোদার ভালোবাসার প্রত্যাশী হয়ে থাক তবে, মহানবী (সা.)-এর মুখে ঘোষণা করিয়েছেন যে, তাঁর অনুসরণ কর, তবেই খোদার ভালোবাসা লাভ হবে।

এরপর মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বর্ণনা করেছি আর এখনো এটি বলা অত্যুক্তি হবে না, তাই আমি বলতে চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা যে নবীদের প্রেরণ করেন আর শেষে যে তিনি মহানবী (সা.)-কে জগদ্বাসীর হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন এবং কুরআন করীম নাযিল করেছেন, এর কারণ কী? প্রত্যেক ব্যক্তি যখন কোন কাজ করে, সেই কাজের পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। এই কথা মনে করা যে, কুরআন নাযিল করা বা মহানবী (সা.)-এর প্রেরণের পিছনে খোদার কোন উদ্দেশ্য নেই, এটি চরম অবমাননা এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত বৈকি! কেননা, এতে (নাঊযুবিল্লাহ্) একটি বৃথা কাজ খোদার প্রতি আরোপিত হয়। অথচ খোদা তা'লার সত্তা অতিশয় পবিত্র, (সুবহানাহু ওয়া তা'লা শানুহু)। অতএব, স্মরণ রেখো! পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা এবং মহানবী (সা.)-কে প্রেরণের পিছনে খোদার উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীর সামনে তাঁর অসাধারণ রহমতের

নিদর্শন প্রদর্শন করা, যেভাবে তিনি বলেছেন, 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন' (সূরা আল্-আম্বিয়া: ১০৮)। অনুরূপভাবে কুরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'হুদাল্লিল মুত্তাকীন' (সূরা আল্-বাকারা: ০৩)। এগুলো এমন মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,যার সমকক্ষ কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)

এরপর কুরআনের সুমহান মর্যাদা এবং কুরআনে বিভিন্ন ঐশী গ্রন্থের যাবতীয় উৎকর্ষের সমাহার রয়েছে। এগুলো শুধু অতীতের গল্প-কাহিনী হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি বরং মু'মিনের জন্য আমল করতে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, বিভিন্ন নবীর মাঝে যে সমস্ত উৎকর্ষ ছিল, তিনি যেন তা মহানবী (সা.)-এর সত্তায় সমবেত করে দেন। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন গ্রন্থে যেসকল গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, তা কুরআনে সন্নিবেশ করে দেন আর একইভাবে সকল উম্মতের মাঝে যত সব মহিমাপূর্ণ বৈশিষ্ট ছিল তা এই উম্মতের মাঝে একত্রিত করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা চান, আমরা যেন এই সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করি। আর এ কথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যিনি আমাদেরকে সেই পরম-শ্রেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকারী বানাতে চান, সে অনুপাতে শক্তিবৃত্তিও তিনি আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। কেননা, সেই অনুপাতে যদি শক্তি-বৃত্তি দেয়া না হতো, তাহলে সেই সকল শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের জন্য পাওয়া সম্ভবই হতো না। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি কিছু লোককে নিমন্ত্রণ জানায়, তবে তার জন্য আবশ্যক,আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা অনুসারে খাবার প্রস্তুত করা এবং তদানুসারে জায়গারও সংকুলান থাকা। (অর্থাৎ, দাওয়াতের জন্য জায়গাও যেন থাকে)।

এটি হতে পারে না যে, এক হাজার ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করবে আর তাদেরকে বসানোর জন্য ছোট্ট একটি কামরা বা ঘর বানাবে। (দাওয়াত করবে হাজার মানুষকে আর জায়গা রাখবে ছোট) না, বরং সে সেই সংখ্যার ব্যাপারে পুরো সচেতন থাকবে, (তাদের বসার জায়গাও সেই অনুপাতেই করতে হবে।) অনুরূপভাবে খোদার গ্রন্থও একটি নেমন্তন্ন বা আতিথেয়তার মত। (কুরআন একটি নেমন্তন্ন বা আতিথেয়তা সদৃশ।) এর জন্য সমগ্র পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, (এ নিমন্ত্রণ তথা শরিয়তের বিধি-বিধান সমগ্র পৃথিবীর জন্য।) এই নেমন্তন্নের জন্য খোদা তা'লা যে ঘর প্রস্তুত করেছেন তা হল, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।" (মানুষের মাঝে যে সব শক্তি-নিচয় রয়েছে, তাহল সেই বসার স্থান। তাই, প্রতিটি মানুষের জন্য এটি বলা যে, আমরা কুরআনের অমুক নির্দেশ মেনে চলতে পারি না, এটি কঠিন, এমন ধারণা পোষণ করা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সেই সমস্ত শক্তি-বৃত্তি দিয়েছেন, যার দ্বারা আমল করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন,) "তাদেরকে অর্থাৎ, এই উম্মতকেযা কিছু দেয়া হয়েছে," (সেই সব প্রকৃত মুসলমান, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদেরকে এ শক্তি-বৃত্তি দেয়া হয়েছে।) তিনি বলেন, "শক্তি-বৃত্তি ছাড়া কোন কাজ সাধিত হতে পারে না।" তিনি আরো বলেন,"এখন যদি ষাঁড়, কুকুর বা অন্য কোন প্রাণীর সামনে কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তাদের জন্য তা বুঝা সম্ভব নয়। কেননা, তাদের ভেতর কুরআনের শিক্ষা বহনের জন্য যে শক্তি-বৃত্তি তা নেই। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদেরকে সেই শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন, যেন আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৩৪১, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)

অতএব, এ কথা বলে মানুষ যদি নিজেকে পশু মনে করে যে, আমার ভেতর শক্তি-বৃত্তি নেই, কুরআনের শিক্ষা মেনে চলার শক্তি ও সামর্থ্য নেই, (তবে এমন ধারণা ঠিক নয়।) আল্লাহ্ তা'লা একজন মুসলমানকে সেই শক্তি-বৃত্তি সত্যিকারে দিয়েছেন। কুরআনের নির্দেশ পালনের জন্য সেগুলোকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব মানুষের নিজের।

মুসলমানদের আচার-আচরণ কেমন? ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর জন্য তিনি (আ.) কতটা আত্মাভিমান রেখে নসীহত করেছেন? আর এই যুগে সবচেয়ে বড় ইবাদত কী, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব হল, এ যুগে ইসলাম যে সমস্ত নৈরাজ্যের সম্মুখীন, তা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রাখা। আর বড় ইবাদত হল, এ সব নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের কিছু না কিছু ভূমিকা রাখা। অর্থাৎ, এখন যে সমস্ত পাপ ও অবমাননাকর বিষয়াদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলোকে নিজের বক্তৃতা ও জ্ঞানের মাধ্যমে এবং খোদা প্রদত্ত সকল শক্তিবৃত্তিকে নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগিয়ে ধরাপৃষ্ঠ থেকে দূর করা। এ পৃথিবীতেই কেউ যদি আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, তবে এতে তারকী লাভ? এ দুনিয়াতেই কোন মর্যাদা লাভ করলে তার কী এমন লাভ হল? পারলৌকিক প্রতিদান বা পুরস্কার লাভের চেষ্টা কর, যার কোন সীমা নেই। সকল মুসলমানের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ এবং তৌহীদের জন্য সেইভাবে আত্মাভিমান থাকা উচিত, যেভাবে নিজের একত্ববাদের জন্য খোদা তা'লার আত্মাভিমান রয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করে বল, পৃথিবীতে এমন নির্যাতিত কোথায় আছে, যতটা নির্যাতিত ছিলেন আমাদের নবী (সা.)? এমন কোন আবর্জনা, গালি এবং বাজে নাম নেই, যা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয় নি! এটি কী মুসলমানদের জন্য মুখ বন্ধ করে বসে থাকার সময়?

এখনো যদি কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান না হয় আর সত্যের পক্ষে সত্য সাক্ষ্য দিয়ে মিথ্যাবাদীর মুখ বন্ধ না করে আর কাফেররা আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতি নির্লজ্জতার সাথে অপবাদ আরোপ করতে থাকুক এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকুক, এটিকে যদি সে সহ্য করে, তাহলে তোমরা স্মরণ রেখো! এমন ব্যক্তি কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। নিজের যতটা জ্ঞান ও জানাশোনা রয়েছে, তোমাদের উচিত এ পথে তা ব্যয় করা।" (তোমাদের মাঝে ধর্মের যতটা জ্ঞান আছে, তা এই পথে ব্যয় কর।) "মানুষকে সমস্যার কবল থেকে রক্ষা কর। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, তোমরা যদি দাজ্জালকে বধ না-ও কর, তবুও সে মরবেই। এ প্রবাদটি প্রসিদ্ধ যে, 'হার কামালে রা যাওয়ালে' (অর্থাৎ, চূড়ায় পৌঁছার পর, পতন তো একদিন অবশ্যম্ভাবী)। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই এসব বিপদের সূচনা হয়েছে। এখন এর ধ্বংসের সময় সন্নিকট। তাই প্রতিটি

যে ব্যক্তি আহমদী আখ্যায়িত হয়েও এই কথায় বিশ্বাস রাখে না যে, রসূলে করীম (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সে অবাধ্য, বিদ্রোহী, অনাচারী, দুরাচারী এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত। আর এমন ব্যক্তির সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কোন সম্পর্ক বা সংস্রব নেই। হ্যাঁ! এ কথা সত্য যে, আহমদীরা 'খাতমে নবুয়্যত'-এর সেই অর্থ করে, যা স্বয়ং মহানবী (সা.) করেছেন আর কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা সে বিষয়ই বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব এবং তাঁর শরীয়তের গন্ডী বহির্ভূত হয়ে এখন কোন নবীই আর আসতে পারবে না।

মুসলমানের আবশ্যিক দায়িত্ব হল, মানুষকে জ্যোতি ও আলো দেখানোর জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করা। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫, সংস্করণ ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত।)

যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এই আলো এবং জ্যোতির প্রসার ও প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাঁর হাতে বয়আত করেছি, এটি আমাদের সৌভাগ্য। এই কাজকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব এখন আমাদের উপর।

বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে তাঁর এক ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সেই ইলহামটি হল, "সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলে মুহাম্মাদীন, সাইয়্যেদে উলদে আদম, ওয়া খাতামান্নাবীঈন। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি আদম সন্তানের সর্দার এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)।" তিনি (আ.) বলেন, "এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে,এ সকল উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং পুরস্কার তাঁর কল্যাণেই লাভ হয় আর তাঁকে ভালোবাসারই পুরস্কার এটি। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সেই দু'জগতের সর্দারের কতই না উচ্চ মর্যাদা এবং নৈকট্যের অধিকারী যে,তাঁর প্রেমিক খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয় আর তাঁর সেবক সারা পৃথিবীর সেবায় ধন্য হয়।

হিচ মেহবুবে নুমান্দ হামচু ইয়ারে দিলবারাম,
মেহের ও মাহ্ রানীস্ত্ কাদরে দার্‌দিয়ারে দিলবারাম
অঁ কুজা রুয়ে কেহ্ দরাদ হামচু রাভীশে আব ও তাব,
ওয়া কুজা বাগে কেহ্ মেহের দরাদ বাহারে দিলবারাম

অর্থাৎ, আমার প্রেমাস্পদের মত কেউ নেই, তাঁর মোকাবিলায় চন্দ্র-সূর্যের কোনই মূল্য নেই, তাঁর চেহারার মত ঔজ্জ্বল্য রাখে এমন চেহারা কোথায় আর এমন বাগান কোথায় যাতে আমার প্রেমাস্পদের ন্যায় বসন্ত বিরাজ করে।

দরূদ শরীফ কোন উদ্দেশ্যে পড়া উচিত এই কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "দরূদ শরীফ... এ উদ্দেশ্যে পড়া উচিত, যেন খোদা তা'লা তাঁর পরম উৎকর্ষপূর্ণ কল্যাণরাজি তাঁর মহান নবীর প্রতি অবতীর্ণ করেন। আর সমগ্র বিশ্বের জন্য তাঁকে যেন কল্যাণের উৎসস্থলে পরিণত করেন। তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও মহিমা যেন উভয় জগতে প্রকাশ করেন। এই দোয়া পূর্ণ বিনয়ের সাথে করা উচিত, যেভাবে সমস্যা কবলিত কোন মানুষ বিগলিত চিত্তে দোয়া করে থাকে।" (দরূদ শরীফ পড়ার সময় মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদার জন্য ঠিক সেভাবে দোয়া করা উচিত, যেভাবে মানুষ সমস্যায় জর্জরিত হলে দোয়া করে।) "বরং আরো বেশি আহাজারি আর আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করা উচিত। নিজের কোন স্বার্থ এর মাঝে জড়িত থাকা উচিত নয়।" (তিনি বলেন, এ দোয়ার মাঝে নিজের জন্য কিছু রাখা উচিত নয়) অর্থাৎ, এর মাধ্যমে আমি এ সোয়াব বা পুণ্য পাব অথবা এ মর্যাদা লাভ করব। বরং নিখাদ এ উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত যে, পরম উৎকর্ষপূর্ণ ঐশী কল্যাণরাজী মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হোক, তাঁর প্রতাপ যেন ইহকালও পরকালে জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশ পায়। [মাকতুবাতে আহমদ (আ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৩, সংস্করণ ২০০৮ইং]

অতএব, শত্রু আমাদেরকে যা-ই বলুক না কেন আর আমাদের প্রতি যে অপবাদই আরোপ করুক না কেন, আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি খাঁটি ভালোবাসা বিরাজমান এবংতাঁর খাতামান্নাবীঈন হওয়া সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদের সবচেয়ে বেশি রয়েছে। এ সব কিছুই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দান করেছেন। আল্লাহ্ করুন, শত্রুর প্রতিটি আক্রমণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনার পর আমরা যেন ঈমানে অধিক অগ্রগামী হই এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি যেনপূর্বের তুলনায় অধিক হারে দরূদ প্রেরণ করতে পারি, যার ফলে সাধারণ মুসলমানরাও যেন তাঁর এই মর্যাদার সঠিক উপলব্ধি লাভ করে আর এ সব বিভ্রান্ত মুসলমান যেন সঠিক পথে ফিরে আসে এবং পৃথিবীতে ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার যেন বিস্তার ঘটে।

(আল ফযল ইন্টান্যাশনাল, ৬ জানুয়ারি ২০১৭)
কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১০ম কিস্তি)

সমাজ ব্যবস্থার দু'টি আবহাওয়া

পবিত্র কুরআন দু'টি সামাজিক আবহাওয়ার কথা বলে :

ক) এক, যে অবস্থায় অশুভ অবাধে বিস্তার লাভ করে;

খ) দুই, যে অবস্থায় অশুভের বৃদ্ধিকে কঠোরভাবে দমন করা হয়।

আপনি যদি ইসলামিক নৈতিক শিক্ষাগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করেন, তাহলে যে কোন পাশ্চাত্য মন বা মেধার পক্ষে সেই শিক্ষার বাণীর দর্শন উপলব্ধি করা খুবই কঠিন হবে। এর কারণ হচ্ছে, নৈতিক শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে হয় একটি সামাজিক আবহাওয়ার অংশ হিসেবে। কাজেই, এই শিক্ষাগুলিকে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে। আপনি কেবল একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়া দেখে কিংবা সব পাতার হলদে হয়ে যাওয়া দেখেই ঠাওর করতে পারবেন না যে, এটা শরৎকাল। আপনাকে শরৎকালের গোটা আবহাওয়া এবং তাপমাত্রাকে মনশ্চক্ষুতে অবলোকন করতে হবে এবং তা অনুভব করতে হবে, যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন যে, শরৎকালটি কী এবং তা উদ্ভিদ জগতের কি কাজে লাগে। ঠিক তেমনিভাবে, একটি সোয়ালো পাখী (শীতকালে দেশান্তরে যায় এমন পাখী) এলেই গ্রীষ্ম আসে না। কার্যতঃ, শরৎ জীবনকে নিরুদ্যম করে আর বসন্ত করে উদ্দীপ্ত। এটা শুধু তাপমাত্রার পরিবর্তন না, এটা গোটা আবহাওয়ারই রূপান্তরণ। তখন মনে হয় যেন বাতাস জীবনের শ্বাস ফেলছে। সমাজব্যবস্থাগুলিও ঋতু বা মৌসুমের মতই, এদেরও আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব।

বস্তুবাদী সমাজের দম্ভ এবং তার চূড়ান্ত পরিণতি

ইসলাম ঠিক একইভাবে এই বিষয়টাকেও পেশ করে। প্রথমে, আমি এমন একটা সমাজের বর্ণনা দিতে চাই, যা কুরআন করীমের মতে অনৈসলামিক ঃ

'তোমরা জেনে রাখো, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাকচিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায়, যার (যার দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সব্জী কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয়, এবং তুমি তাকে হলুদবর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এবং পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতীত কিছু নয়। (আল্-হাদীদ ৫৭ঃ২১)

আবার বস্তুবাদী জীবনের দম্ভ ও ফুটানি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কথা হচ্ছে ঃ

'এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিশাল মরুভূমিতে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়, যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মনে করে পানি। এমন কি সে যখন তার নিকটে পৌঁছেছে তখন সে তাকে দেখে যে, তা কিছুই নয়। এবং আল্লাহ্‌কে নিজের নিকটে দেখতে পায়। তখন আল্লাহ্ তাকে তার হিসাব পূর্ণ মাত্রায় চুকিয়ে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। (আল্ নূর- ২৪ঃ৪০)

পবিত্র কুরআন এটাকে বর্ণনা করেছে মরীচিকা রূপে যা কিনা তৃষ্ণার্ত মানুষকে বার বার আশা দিয়ে দিয়ে নিরাশ করে এবং তার কাছ থেকে সর্বদাই দূরে দূরে থাকে, এমন কি সেই ব্যক্তি তার নাগাল পাবার জন্য তার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে অবশেষে এতটা অবসান্ত হয়ে পড়ে যে, তখন পিছনে ছুটবার আর ক্ষমতাই

তার থাকে না। অর্থাৎ তখন সে তার শাস্তি পেয়ে যায়। তখন সে উপলব্ধি করতে বাধ্য হয় যে, এটা একটা ফাঁকা, একটা শূন্য লক্ষ্যস্থল, যেখানে পৌঁছবার সে চেষ্টা করেছে এতকাল। সহসাই, সেই মরীচিকার দূরে সরে যাওয়া থেমে যায় এবং তাকে শাস্তির পিছনে ছুটে চলার তিক্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। এটাই সেই শাস্তি যা দেওয়া হয় তাদেরকেই যারা জীবনের দাম্ভিকতার অনুসরণ কর, এবং এভাবেই, পবিত কুরআনের মতে, মেষ হয়ে যায় অনুরূপ সব সমাজও। এর বিপরীতে, ধর্ম এমন একটা আদর্শের কথা বলে, যা ঘোষণা করে যে, এই পার্থিব জীবনটাই সবটুকু নয়, শেষ নয়; বরং এর পরও একটা জীবন আছে– পরকালের জীবন।

আমরা যদি এখানে এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ না করি-বরং কোন না কোন আকারে বেঁচেই থাকি, যা কিনা ইসলাম ও অন্যান্য অনেক ধর্ম আমাদেরকে বিশ্বাস করতে শেখায়– যদি পার্থিব জীবনকে পরকালের জীবন থেকে আলাদা করা না যায়; এবং যদি উভয় জীবনকে এভাবেই বুঝতে হয় যে, একটা আর একটার ধারাবাহিকতা; তাহরে এই পৃথিবীর বুকে ব্যক্তির ওপরে সামাজিক প্রভাবের যে ভূমিকা তাকে উপেক্ষা করাটা নিতান্তই অজ্ঞতার কাজ হবে। কারণ, অশুভ, অনৈতিক এবং অস্বাস্থ্যকর প্রভাবসমূহ পরকালের জীবনে একটা অসুস্থ আত্মার জন্ম দিতে বাধ্য।

পারলৌকিক জীবনের প্রত্যাখ্যান

পরকালের জীবন সম্পর্কে ইসলামের যে দর্শন, তার বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে, এখানে এতটুকু বললেই হয়তো যথেষ্ট হবে যে, ইসলামের মতে, এখানে– পৃথিবীতে আমরা যেভাবে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি, তা আমাদের আত্মাকে ঠিক সেভাবেই প্রভাবিত করে, যেভাবে প্রভাবিত করে গর্ভের সন্তানকে ভ্রূণের অবস্থা থেকেই তার গর্ভধারিণী মায়ের কোন রোগ। সেই শিশু জন্মবধি প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে, তাহলে, তার জীবনটাই তার জন্য একটা জাহান্নাম হয়ে দেখা দিবে। তাকে তখন, আর দশটা সুস্থ সুঠাম ছেলেমেয়ের মধ্যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে। এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা তার জন্য আরও বেশী কঠোর হবে এবং তীব্র হবে তখন, যখন তার বিবেকের পূর্ণতা আসবে। এটা হচ্ছে, সংক্ষেপে, ইসলামের মতে, আমরা কী করে আমাদের নিজেদের বেহেশ্‌ত এবং দোযখ নিজেরাই গড়ে তুলি, তারই দৃষ্টান্ত।

এ প্রসঙ্গে, এটা এখন পরিস্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে, যে কোন সমাজ ব্যবস্থা যা দায়িত্বহীন, বিশৃংখলা এবং অশুভ আচরণের জন্ম দেয়, তা সে বাইরের দর্শকের কাছে যতই আকর্ষণীয় আর যতই লোভনীয় হোক না কেন, তাকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

মু'মিনদের পক্ষ থেকে পরজগৎ সম্পর্কীয় এই সব কথা বলতে এবং এই জাতীয় দাবী করতে তো কোন অসুবিধা নেই। কেননা, কেউ তো আর পরকালের জগৎ থেকে ফিরে এসে তাদের দাবীগুলো পরখ করে দেখছে না বা তাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যও দিচ্ছে না? তবে, নীড়ের দুটো পাখীর বদলে হাতের একটা পাখী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে দোষটা কি? এটাই হচ্ছে বস্তুবাদী জবাব ইসলাম দর্শনের বিপক্ষে,- যে দর্শনে বলা হয়েছে, কীভাবে সমাজ গঠন করতে হবে এবং কোন্ কোন্ নীতির ভিত্তিতে তা গঠিত হতে হবে।

ইসলামের দর্শনের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই পৃথিবীর অর্থাৎ ইহকালেরও জীবন এবং পরকালেরও জীবন। এই জীবন একটা ধারাবাহিক প্রবাহ, যাতে একটা সাময়িক ছেদ পড়ে মাত্র মৃত্যু ঘটলে। এবং এই যে মৃত্যু, তা আসলে এক জীবন থেকে আর এক জীবনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার একটা পর্যায় মাত্র। এর বিপরীতে, বস্তুবাদী দর্শন ধারণা করে যে, জীবন একটা সীমিত ব্যাপার, যা বিবেকের একটা আকস্মিক বিস্তার মাত্র। এবং যা মৃত্যুর মুহূর্তে নাস্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং, এই সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্কে শুধু সীমিত ইহজীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের সঙ্গেই। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার জীবিত থাকাকালীন সময়ের জন্য সমাজের কাছে জবাবদিহি করার জন্য দায়ী থাকে। এবং তা-ও শুধু তার জীবনের যে অংশটুকু গোচরীভূত হয় বা ধরা পড়ে তার জন্যেই। বাকী যে অংশ সমাজের অগোচরে থাকে, তা তার চিন্তা, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, হীন যন্তরূপেই হোক, আর সূক্ষ্মভাবে গোপনে সংঘটিত অশুভ কোন অপরাধই হোক-যা ধরা পড়ে না, তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয় না।

তাছাড়া, সমাজের বিরুদ্ধে কৃত কোন অপরাধকে কেবল তখনই অপরাধরূপে প্রমাণিত হবে যে, হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই সেই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে, সঠিক বা ন্যায্য-বিচার না হওয়ার সম্ভাবনা তো থাকেই, তদুপরি এই সমাজ ব্যবস্থায়, বিচার কার্যপ্রণালী শুধু ভাসাভাসা এবং সীমাবদ্ধই নয়, বরং তা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের পক্ষে সহায়কও বটে। এই অবস্থায় কায়েমী স্বার্থের প্রসার ঘটায় এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে চরম স্বার্থপরতাকে উৎসাহিত করে।

আরও একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোন নিরীশ্বরবাদী বা আধা-নিরশ্বরবাদী সমাজে, যেখানে মৃত্যুর পরবর্তী জবাবদিহিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয় কিংবা তা এমন হাল্কাভাবে ও অস্পষ্টভাবে মানা হয় যে, তা কার্যতঃ অর্থহীন হয়ে পড়ে– সেখানে অপরাধের এমন কোন সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করাই একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যা কোন যথার্থ নৈতিক দর্শন কর্তৃক সমর্থিত হতে পারে। নিরীশ্বরবাদী সমাজের লোকেরা যখন কোন আইন ভঙ্গ করে তখন যে তারা সেটা অপরাধ করে, সে ব্যাপারে তারা নিজেরা সত্যি সত্যিই রাজী (কনভিন্সড্) কিনা, তা বুঝে ওঠা মুশকিল। কথা হচ্ছে, আইন কি? এটা কি কোন একচ্ছত্র রাজার কথা? নাকি এটা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ গণতন্ত্রের নির্দেশ? এবং তা গ্রাহ্য হবে কোন নৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে সঠিকরূপে প্রণীত বলে? তাছাড়া নৈতিক দর্শনটাই বা কি?

সে যদি কোন সত্তার কোন ধারই না ধারে, অথবা তার যদি পরকালের প্রতি বিশ্বাস না থাকে এবং তার যদি ইহকালের জীবনের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন

হওয়ার কোন ভয় না থাকে, তাহলে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে সে তার সুবিধাজনক অবস্থান থেকে যা বলবে, তা একটা দায়িত্বশীল সমাজের জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। তার তো আছে মাত্র ইহকালের এই সীমিত জীবন। তার সমাজের প্রয়োজন শুধু তার সুখ-সুবিধার জন্যই। সে শুধু তার নিজস্ব প্রয়োজনের তাকিদেই তার সমাজের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিতান্ত অপারগ হয়েই।

সে যদি তার নিজের স্বার্থের অনুকূলে কোন সুযোগ পেয়ে যায়, এবং খুব চালাকীর সাথে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে আনন্দে কাটাবার জন্য কিছুটা সময় করে নিতে পারে, তাহলে সে তা করবে না কেন? তথাকথিত কোন্ সে 'নৈতিক' বিধি-নিষেধ তাকে বাধা দিবে?

অপরাধের প্রতি এই যে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, যার সূচনা হয়েছিল নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুবাদী সমাজগুলোতে, তা এখন সময়ের ব্যবধানে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এবং ঠিক এটাই বলা হয়েছে কুরআন করীমে বস্তুবাদী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যরূপেঃ

"আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই, আমরা মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত থাকি; বস্তুতঃ আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব না।" (আল মুমেনূন ঃ ২৩ঃ৩৮)

এছাড়াও, অবিশ্বাসীরা পূর্ববর্তী নবী-রসূলদেরকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসার সুরে বলেঃ

"এবং তারা এ-ও বলে, কী! যখন আমরা হাড়গোড়ে পরিণত হব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি বাস্তবিকই আমাদের (আবারও) এক নতুন সৃষ্টির আকারে উত্থিত করা হবে?" (বনী ইসরাঈল ১৭ঃ৫০)

"তারা বলে, কী! যখন আমরা মৃত্যুবরণ করবো, এবং মাটি হয়ে যাব এবং হাড়গোড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা বাস্তবিকই পুনরুত্থিত হব?" (আল্ মুমেনূন ঃ ২৩ঃ৮৩)

এটাই হচ্ছে কুরআন মজীদের মতে, বস্তুবাদী সমাজের সকল অশুভ ও অকল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু। এবং এ কারণেই, এত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে পরকালের জীবনের প্রতি এবং বিচার দিবসের প্রতি।

ইবনে মাসূদ (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, হযরত রসূলে পাক (সা.) একটি আয়তক্ষেত্র আঁকলেন এবং এর মাঝ দিয়ে লম্বালম্বি একটা রেখা টানলেন, এই মধ্যরেখাটির ওপরে আড়াআড়ি করে আরও কতগুলো রেখা টানলেন।

তিনি এর দ্বারা বুঝতে চাইলেন যে, এই চিত্রটি একটি মানুষ এবং এর চতুর্পাশের আয়তক্ষেত্রটি মৃত্যু, মধ্যরেখটি তার কামনা-বাসনা, এবং ছোট ছোট রেখাগুলো তাঁর জীবনের পরীক্ষা ও বিপদ আপদ। তিনি বললেন যে, এগুলোর একটাতেও যদি তার পদস্খলন ঘটে, তাহলে সে পরবর্তীগুলোর যে কোনটার শিকারে পরিণত হবে। (বুখারী)

অন্য একটি হাদীসেও বলা হয়েছে যে, মৃত্যু হচ্ছে আমোদ-প্রমোদের পরিসমাপ্তি।

(চলবে)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রাপ্ত যুগ-খলীফার সফরে আশিসমন্ডিত হলো কানাডা

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

(৫ম কিস্তি)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ পাকিস্তানের আহমদী মুসলমানরা প্রায়ই আমাকে দুঃখের সাথে দোয়ার জন্যে লিখে থাকেন যে, আইন যেন বদলে যায়, যাতে তারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে, অথবা এমন হল- ঘর নির্মাণ করতে পারে, যেখানে তারা বাজামাত নামায আদায় করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে তারা এমন কোন একটি কক্ষও নির্মাণ করতে পারে না, যেখানে ইমামের দাঁড়ানোর জন্যে একটি বাড়তি স্থান থাকতে পারে, আর তাই মিনার ও গম্বুজওয়ালা মসজিদ নির্মাণের তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা। বস্তুত: কতিপয় স্থানে অবস্থাতো এরকম যে, আহমদী মুসলমানরা এমন কোন দালানও তৈরী করতে পারে না, যেটা ক্বিবলামুখী"। হুযূর (আই.) বলেন যে, এমনই এক সময়, যখন বস্তুবাদ প্রাধান্য বিস্তার করছে, তখন আহমদী মুসলমানদের কাজই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের মহিমা কি, তা অন্যদেরকে অবহিত করা।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "বিশ্বের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানুষ এ মহূর্তে বস্তুগত উন্নতিকেই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে। এমন এক সময়ে মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বকে এটা অবহিত করা যে, বস্তুবাদের অনুসরণ চিরন্তন কোন আনন্দ বয়ে আনতে পারে না, বরং সুখ ও শান্তির সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী উপায় খোদার অধিকার পূরণের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়"।

হুযূর (আই.) বলেন যে, স্থানীয় লোকদের মধ্যে মসজিদ অবশ্যই কৌতুহল সৃষ্টি করবে এবং স্থানীয় লোকরা সেসব লোকের আচরণ লক্ষ্য করবে, যারা মসজিদে হাজির হয়। অতএব, আহমদী মুসলমানদের জন্যে এটা আবশ্যক যে, তারা সর্বদা উত্তম নৈতিক-আচরণ এবং ধার্মিকতা প্রদর্শন করে।

জুমুআর খুতবার উপসংহারে হুযূর (আই.) দোয়া করেন ঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের সন্তানদেরকে এটা বুঝতে দিন যে, তাদের পিতা-মাতারা যেসব কুরবানী করেছেন, যে মসজিদটি বানিয়েছেন, ইসলামের সত্যিকার- শিক্ষা, নৈতকিতা ও যে আধ্যাত্মিকতা তারা তাদের সন্তানদেরকে দান করেছেন, বস্তুতঃ সেটাই হচ্ছে তাদের আসল সম্পদ, যা তারা তাদের জন্যে রেখে গেছেন। ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের সৌভাগ্যশীল এসব সন্তানদের মধ্যেও আল্লাহ্ এ প্রত্যয়কে জাগরূক রাখুন"।

৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণ-প্রিয় নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার রেজিনায় মাহমুদ মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিশেষ এক স্বাগত–অধিবেশনে মূল-বক্তব্য প্রদান করেন। সাসকাচিউনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ব্রাডওয়াল সহ ১৮০ জনের অধিক অতিথি রেজিনার রামাদা প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত বৈকালিক এ সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন। এ বক্তৃতায় হুযূর (আই.) মসজিদ সমূহের সত্যিকার উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করেন এবং মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চলমান প্রতিশ্রুতির বিষয়ে কথা বলেন। শুরুতেই হুযূর (আই.) মুসলিম বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে সেটাকে 'চরম বিপজ্জনক এবং বিক্ষোভপূর্ণ' বলে বর্ণনা করেন। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "এ সত্যটি সম্পর্কে আমরা সবাই ভালভাবে অবগত আছি যে, কতিপয় চরম-পন্থী মুসলিম-দল আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ভয়ঙ্কর পাশবিকতা সাধন করছে। যেখানেই তারা পরস্পরে যুদ্ধ করছে, সেখানে তারা তাদের নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছে। একইভাবে, কতিপয় সরকারও তাদের নাগরিকদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, আর তাই বিদ্রোহী দলগুলো গঠিত হয়েছে এবং হিংসাত্মক বিরোধিতায় অংশ নিচ্ছে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "এসবের ফলে কতিপয় মুসলিম-দেশের সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার পরিবর্তে ওসব দেশ অস্থিরতা ও ধ্বংসের এক চিরস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ অর্থহীন-চক্রের পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। যা ঘটছে, তাকে কেবল মানবতার ওপর অসীম এক কলঙ্ক হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন যে, রেজিনার স্থানীয় লোকজন এবং সাসাকাচিউন প্রদেশের লোকদের সাথে যখন আহমদী মুসলমানদের এক সুসম্পর্ক বিদ্যমান, তখন স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন এক অংশ থাকতে পারে, যাদের অন্তরে এ মসজিদটির উদ্বোধন এক ভীতির উদ্রেক ঘটাতে পারে। যাহোক, হুযূর (আই.) এমন ভীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং স্থানীয়-লোকদেরকে এ বিষয়ে আবারো অভয় দান করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর (আই.) বলেন ঃ "আমাদের আহমদী মসজিদগুলোতে কেবল সে-নক্‌শাটিই অংকন করা হয়, যেটা নির্ধারণ করে, কিভাবে আমরা সেসব

লোকের মর্মব্যথা ও দুঃখ উপশম করতে পারি, যারা শোক-সন্তপ্ত এবং বঞ্চিত। তাদের প্রচন্ড ক্রোধ এবং নৈরাশ্যের ভারী বোঝা অপসারণ করতে আমরা কেবল তেমন সব পরিকল্পনাই হাতে নিই, যেগুলো কষ্টে নিপতিত ও দুর্ভাগ্য-কবলিত লোকদের হতাশা ও নৈরাশ্যের অপনোদন করে"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "আপনারা দেখতে পাবেন যে, এ মসজিদটি এমন এক আলোক-সংকেত হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, যেটা সমাজকে বদান্যতা, সহানুভূতি এবং অনুগ্রহের সার্বজনীন মান দ্বারা আলোকিত করেছে। আপনারা দেখবেন, কিভাবে এ মসজিদটি মানবজাতির সবার জন্যেই শান্তি, সমৃদ্ধি ও পবিত্র স্থানের এক গৌরবময় প্রতীক বলে প্রমাণিত হয়েছে"।

মানব সেবার ক্ষেত্রে ইসলামের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং ইসলামের নবী (সা.) এর অনুশীলন দ্বারা কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে বিষয়েও হুযূর (আই.) আলোকপাত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) বলেন ঃ "পবিত্র নবী (সা.) এর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোমকূপ এবং প্রত্যেক আঁশ থেকে চিরন্তন করুণা ও সহানুভূতি নিঃসৃত হয়েছে, আর তাই সত্যিকার মুসলমানরা, যারা তাকে অনুসরণ করে, তারা কোন অসদুদ্দেশ্যে কিংবা অন্যদের ক্ষতি করার জন্যে মসজিদগুলোয় কখনোই প্রবেশ করতে পারে না। সত্যিকারের একটি মসজিদ সকল স্তরের সকল মানুষের শান্তির এক জামিনদার; আর খোদা না করুন, কোন মসজিদ যদি এসব ধার্মিক-উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয়ে না থাকে, তবে এটা এর উদ্দেশ্য পূরণ করছে না"।

হুযূর (আই.) বর্ণনা করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মানবতার সেবায় নিয়োজিত আছে এবং বিশ্বের বঞ্চিত অংশগুলোয় স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ করছে এবং মানব-হিতৈষী অন্যান্য প্রকল্পও স্থাপন করে চলছে। পরিস্কার পানির গুরুত্ব এবং বিশ্বের দূরতম অংশের মানুষের জন্যে এটার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কাজে আহমদীয় মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টার কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "পরিষ্কার পানি হচ্ছে জীবন রক্ষার একটি উপায়, আর তা সত্বেও বিশ্বের অনেক অংশেই এমন সব লোকও আছে, যাদের এটাতে সামান্য কিংবা কোন অধিকারই নেই। আফ্রিকার দেশগুলোয় যদি বৃষ্টিপাত হয়, তবে এর পুকুরগুলো ভরে ওঠে, কিন্তু প্রায়শঃই সেখানে অনাবৃষ্টির কারণে পুকুরগুলো শুকিয়ে যায়, যার ফলে পানির গুরুতর সংকট দেখা দেয়। বস্তুতঃ, এমনকি যেখানে বৃষ্টিপাতও হয়, যারা গ্রামে বাস করে, অথবা দূরবর্তী এলাকায় বাস করে, তারা পরিষ্কার পানি পায় না। কারণ, পুকুরের যে পানি তারা ব্যবহার করে, সেটা সব ধরণের রোগ-জীবণু ও টোমেইন-বিষ দ্বারা দূষিত হয়"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "ট্যাপ-এ ময়লাযুক্ত পানি পাওয়া গেলেও সেটা সংগ্রহের পর ছেলে-মেয়েদেরকে উক্ত পানির পাত্র মাথায় বহন করে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত পথ হাঁটতে হয়। বেশ ক'বছর যাবত আমি নিজে আফ্রিকায় ছিলাম এবং আমি স্বচক্ষে এটা দেখেছি। যে বয়সে ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে থাকতে হয় এবং মুক্তভাবে বিচরণ করার কথা, সে বয়সে পরিস্থিতির কঠিন-চাপে পড়ে তাদেরকে প্রতিদিনের এ রুটিন-কাজ করতে হয়, যেটা আমাদের জন্যে অচিন্তনীয়, যারা পশ্চিমা-বিশ্বে আরাম-আয়েশে বসবাস করছি"।

আফ্রিকায় বসবাসকারী শিশুদের পরিস্থিতির সাথে পশ্চিমা-বিশ্বের শিশুদের পরিস্থিতির বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করে হুযূর (আই.) বলেন ঃ" আমরা, যারা পশ্চিমা-বিশ্বে বসবাস করি, তারা এ নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করি যে, আমাদের শিশুরা প্রতিদিন যথাসময়য়ে স্কুলে যেতে পারছে কি-না, কিংবা অন্য কোন ছোট-খাটো বিষয়ে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি-না। বিশ্বের বঞ্চিত-অংশের লোকদের জন্যে তুচ্ছ এসব সমস্যা হচ্ছে- 'দূরতম এক স্বপ্ন'-বৈ কিছুই নয়। আমাদের শিশুরা এখানে যেসব সুবিধা পাচ্ছে, সেগুলো পেতে ঐসব দেশের শিশুরা যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না"।

এসব কষ্ট দূর করতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সে-দেশের প্রত্যন্ত এলাকার গ্রাম ও শহরে সৌর-পাম্প ও হস্ত-চালিত পাম্প স্থাপন করেছে। আফ্রিকার লোকেরা যখন এ ধরণের মানব-হিতৈষী প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু করলো, সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করার পর স্থানীয় লোকজন, বিশেষ করে তরুণ ছেলে-পিলেরা যখন তাদের দোর-গোড়ায় প্রথম বারের মত পরিস্কার-পানি দেখতে পেলো, তাদের মুখ-মন্ডলে নির্মল এবং লাগামহীন আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, যেটা দেখার মতো। এটা এমন এক ব্যাপার ছিল, যেন তাদের সব আশা ও স্বপ্ন নিমেষেই পূরণ হয়ে গেছে এবং যেন সমগ্র বিশ্বের সব সম্পদ তারা পেয়ে গেছে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আমরা, যারা আহমদী মুসলমান, তারা এমন লোকদের সেবা করতে পেরে গর্ববোধ করি এবং এটা এজন্যে এক আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করি যে, আমরা অন্যদেরকে সাহায্য ও আরাম প্রদান করতে সক্ষম, কারণ এটাই হচ্ছে ইসলামের পথ"।

উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের সত্যিকার-শিক্ষার ওপর কাজ করছে এবং সত্যিকারের এক 'জিহাদ' করে যাচ্ছে, যেটা হলো অপরের সেবা করা এবং মানবজাতিকে একত্রিত করা। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "আমাদের জিহাদ তরবারি, বন্দুক কিংবা বোমা-কামানের কোন জিহাদ নয়, আমাদের জিহাদ হচ্ছে সহিষ্ণুতা, ন্যায়-বিচার এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির জিহাদ। আমাদের জিহাদ হচ্ছে সর্বশক্তিমান খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার পূর্ণ করার জিহাদ"। তিনি (আই.) আরো বলেন ঃ আমরা যদি কোন জিহাদী-দল সৃষ্টি করে থাকি, তবে সেটা কোন নির্দোষ-লোকদেরকে পাশবিক-আক্রমণ করার কিংবা কোন ক্লাবে, ষ্টেশনে অথবা অন্য কোনখানে সন্ত্রাসী-আক্রমণ চালানোর জন্যে নয়, বরং সেটা গঠন করা হয়েছে সর্বদা, সবখানে, এবং সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। এসব উদ্দেশ্য সাধনে হিংসাত্মক ভাবে তলোয়ার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র ঘোরানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের পছন্দের অস্ত্র হচ্ছে– ভালবাসা, করুণা এবং মানবীয়-সহানুভূতি, আর সর্বোপরি দোয়া"।

হুযূর (আই.)-এর মূল-বক্তব্য প্রদানের আগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা-র আমীর জনাব মালীক লাল খানসহ বেশ

ক'জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাও তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর (আই.)কে উদ্দেশ্য করে সাসকাচিউনের প্রধান মন্ত্রী মি: ব্রাডওয়াল বলেন ঃ "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে',–আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এ মৌলিক-নীতিটি হুযূর (আই.) এর কানাডায় শুভাগমনের আগে এবং এর পরেও তারা স্পষ্টতার সাথেই শ্রবণ করেছেন। এটা এমন একটি আদেশ, যেটা যে-কোন সাংস্কৃতিক পার্থক্য, যে-কোন আধ্যাত্মিক পার্থক্য, কিংবা যে-কোন ধর্মীয় পার্থক্যকে অতিক্রম করে। এটা তেমনই এক নৈতিক-শিক্ষা, যা আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই প্রাসঙ্গিক"।

রেজিনা সিটির মেয়র মিঃ মাইকেল ফোগেরি বলেন ঃ "এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে এবং হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানাতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি এবং এখানে আসার জন্যে আমি হুযূর (আই.)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের সিটি, আমাদের প্রদেশকে পছন্দ করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পেরে আমি নিজকে কৃতার্থ বোধ করছি"। আমাদের সিটিতে আপনার পদার্পণ আমাদেরকে শক্তি জুগিয়েছে"।

রেজিনার পুলিশ প্রধান মিঃ ইভান ব্রে বলেন ঃ "এ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি বিশাল এক সম্মান ও সুবিধার অংশীদার হয়েছি, আর নতুন এ মসজিদটির উদ্বোধনী-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমরা সবাই গৌরব বোধ করছি"।

হুযূর (আই.) কর্তৃক পরিচালিত নীরব-দোয়ার মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। এরপর অ-আহমদী অতিথিবৃন্দের সাথে হুযূর (আই.) ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। অনুষ্ঠানটির আগে ও পরে হুযূর (আই.) বেশ ক'জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা ও অতিথিকে তার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দান করেন

(চলবে)

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সম্মানিত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া **বাংলাদেশ-এর ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সের ১২তম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে**। আশা করা যাচ্ছে, এবছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দরখাস্ত আগামী ১০/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণর্স, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবর পৌছাতে হবে। আগামী ২৩/৫/২০১৭ তারিখ থেকে ২৬/৫/২০১৭ তারিখ (রোজ মঙ্গলবার হতে শুক্রবার) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্। **আবেদনকারীকে অবশ্যই ২২/৫/২০১৭ তারিখ বিকাল ৫.০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে রিপোর্ট করতে হবে।**

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ : (১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবে, তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্ব্বোচ্চ বয়স: এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ভর্ত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ওয়াকফে নও অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে, (৮) ভাল আহমদী ও তাক্ওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে-অন্যথায় আবেদনপত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম, (খ) পিতার নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়'আত গ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ উল্লেখ করতে হবে, (ঙ) শিক্ষাগত-যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি সাথে দিতে হবে। (চ) দরখাস্ত নিজ হাতে লিখতে হবে, (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে, নচেৎ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। (জ) জামাতি ও মজলিসি-চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে। (ঝ) ওয়াক্ফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন। (ট) জামাতের এমন দুই জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আবেদনকারী সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন। (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) ব্যক্তির সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করতে হবে।

প্রয়োজনে নিম্নের মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যাবে। ০১৭৭১৭০৫৫১৫, ০১৫৩১২৫১১৪০, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের ও আমাদের সহায় হউন- আমীন।

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
সেক্রেটারী বোর্ড অফ গভর্ণর্স
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৬৪)

হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের জন্য ব্যবহৃত রূপক বর্ণনার তাৎপর্যঃ

প্রত্যেক ভাষায় রূপকের ব্যবহার রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে ভবিষ্যদ্বাণীসহ শিক্ষামূলক বিভিন্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে রূপকের ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণ হলো কতগুলো রূপকাবৃত বর্ণনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থ গ্রহন করার উপর অনেকেই বেশি গুরুত্বারোপ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর শাব্দিক অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তি-সঙ্গত। শুধু শাব্দিক অর্থ গ্রহন করলে বিষয়গুলো হবে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। শাব্দিকভাবে এগুলো পূর্ণতা কেন সম্ভব নয় তা ভেবে দেখার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(১) পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, আখেরী যুগে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) পুনরায় আগমন করবেন ।

(২) সূরা নূরের ৭ম রুকুতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল মুসলিম উম্মাহর জন্য খেলাফতের সংগঠন একটি ঐশী প্রতিশ্রুত বিষয় যেভাবে পূর্ববর্তী মূসায়ী শরীয়তে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

(৩) বুখারী ও অন্যান্য হাদীসে ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

(৪) দাজ্জাল ও দাজ্জালের গাধা এবং ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি? এতদসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করলে সেগুলো হবে খুব অবাস্তব এবং অযৌক্তিক।

(৫) হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর কার্যাবলী সংক্রান্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)–আবির্ভূত হয়ে প্রধানতঃ নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেনঃ

(ক) ক্রুশ ধ্বংস করবেন; (খ) শুকর বধ করবেন; (গ) যুদ্ধ রহিত করবেন এবং ইয়াজুজ–মাজুজের মোকাবেলা করবেন (ঘ) দাজ্জাল বধ করবেন; (ঙ) অঢেল ধন সম্পদ বিতরণ করবেন ইত্যাদি।

(চ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)–এর নাম, বংশ, স্থান বিষয়ে নানা প্রকার বর্ণনা রয়েছে।

এই ধরনের আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলো শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং সুদূর প্রসারী তত্ত্ব ও তথ্যের ইঙ্গিত বাহক।এই ধরনের রূপক বর্ণনার তাৎপর্য কি? পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রূপক বর্ণনার দৃষ্টান্ত, সাহিত্য-কর্ম ইত্যাদিতে রূপকের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই বিষয়গুলো পরিস্কারভাবে জানা দরকার এবং প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর সু-গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, শুধু ভাসা-ভাসা জ্ঞান এবং পুঁথিগত বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অনেক মোল্লাশ্রেণীর পন্ডিতগণ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর শাব্দিকভাবে পূর্ণতার উপর জোর দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হাদীসে বর্ণিত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শাব্দিক অর্থে কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে

ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ঈসা–সদৃশ মহাপুরুষের আগমন হওয়ার কথাই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে আগমনকারী ঈসা (আ.)-কর্তৃক ক্রুশ ধ্বংস করা, শুকর বধ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো শাব্দিক অর্থে শুধু অসম্ভবই নয়, বরং হাস্যোস্পদ এবং একজন সম্মানিত নবীর পক্ষে মর্যাদাহানীকর। কারণ শাব্দিক অর্থে কাঠের বা ধাতু–নির্মিত ক্রুশগুলো ভেঙ্গে ফেলা এবং বনে-জঙ্গলে অথবা ক্ষেত-খামারে শুকরগুলো নিধন করা সম্ভবপর নয় এবং কোন কারণে সম্ভব হলেও নিরর্থক কাজই বটে। ভাবতে অবাক লাগে যে, কিছু কিছু পন্ডিত ব্যক্তিও শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে রূপকের অন্তরালে নিহিত সুগভীর অর্থ–গ্রহণ করতে পারছেন না কেন? এই বিষয়ে যে বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূরীভূত করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা অত্যাবশ্যক। বিশ্ববাসীর প্রকৃত কল্যান এবং ধর্মীয় সমস্যাবলীর প্রকৃত সমাধান বহুলাংশে এই বিষয়টির উপর নির্ভর করছে। অতীতের ন্যায় এই রূপকাবৃত ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে শাব্দিক অর্থেরউপরে বর্তমানে যারা নির্ভর করতঃ বর্ণনাতীত বোকামীর পরিচয় দিয়ে চলেছেন অতি শীঘ্র তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক–এই কামনা করি।

যীশুর পুনরাগমন সম্বন্ধে খৃষ্টান এবং অধিকাংশ মুসলমানগন অদ্যাবধি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে পশ্চিমা জগতে এ সম্বন্ধে নানা প্রকার গুজব ছড়ানো হয়। যীশুর আগমনের তারিখ দিন-মাস ক্ষণসহ পত্র-পত্রিকায় তুলকালাম কান্ড ঘটে যায়।কিছুদিন পর বিষয়টি কর্পুরের মত উবে যায়। মূলত: ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা বুঝতে না পারার কারণে অধিকাংশ মুসলমানগণও হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে গমন, সশরীরে আকাশে ২০০০বছর ধরে অবস্থান এবং যে কোন সময় পৃথিবীতে অবতরণের আশায় অপেক্ষমান রয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত বর্ণনার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করার এই দৃষ্টান্ত মানবজাতির ইতিহাসের এমন একটি ঘটনা যার প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারলে ইহুদী ও খৃষ্টান এবং মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারণার চির অবসান ঘটতে পারে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.) কখন আসবেন, কোথায় আসবেন এবং কিভাবে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং ইসলামের চুড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করবেন-এই সকল বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মুসলমান দল বা ফিরকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং ধ্যান-ধারনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহে এই ধরনের প্রযোজ্য ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সঠিকভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোরাম আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে। তিনি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে চৌদ্দশত হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৩০৬ হিজরী সন, ১৮৮৯ খৃ:) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ–প্রচার কল্পে এবং শান্তিপূর্ণ পন্থায় পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে এক মন্ডলী–ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি এবংতাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফার মাধ্যমে এই সংগঠন বর্তমানে দুই শতাধিক দেশে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচার–কার্য পরিচালনা করে চলেছে। এই বিষয়ে সম্যকভাবে জানার জন্য প্রত্যেক দেশের স্থানীয় কেন্দ্র এবং অন-লাইন www.alislam.org এবং www.mta.tv অথবা www.ahmadiyyabangla.org প্রভৃতি ওয়েবসাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।

রূপক বর্ণনার তাৎপর্য সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি

হযরত মসীহ্ 'মাওউদ (আ.) বলেছেন:

* "আমি বার বার বলিয়াছি এবং ইহাই সত্য কথা যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপকের ব্যবহার খুব বেশী থাকে এবং একাংশ প্রকাশ্য অর্থেও পূর্ণ হয়। এই নিয়মই আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। সমস্ত হাদীসই যদি পূর্ণ হওয়া চাই অর্থাৎ শিয়াদের হাদীস, সুন্নীদের হাদীস এবং এইরূপে সকল সম্প্রদায়ের সকল হাদীসই যদি পূর্ণ হইতে হয় , তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও যে, মসীহ (আ.) অথবা মাহ্‌দী (আ.)-কেহই কখনও আসিবেন না। বিবেচনা কর, আমার চেয়ে রসূল করীম (সা.)-এর আবশ্যকতা অনেক বেশী ছিল। তিনি যখন আসিলেন, সকলেই কি তাঁহাকে মানিয়া লইয়াছিল?

তওরাত বা ইনজীল গ্রন্থে তাঁহার আগমনের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, উহার সবগুলি কি পূর্ণ হইয়াছিল? খোদার উদ্দেশ্যে একবার চিন্তা করিয়া দেখ এবং উত্তর দাও। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল গল্প প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের গ্রন্থে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তৎসমুদয়ই যদি পূর্ণ হইয়া থাকিত, তবে কি কারণে তাহারা তাঁহাকে মানিয়া নেয় নাই? জানিয়া রাখ, সমুদয় লক্ষণ কখনও পূর্ণ হয় না। কারণ কতক লক্ষণ লোকদের কল্পিত, আর কতকগুলি কল্পিত না হইলেও উহার ভূল অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নবী মাত্রকেই অস্বীকার করা হইয়াছে এবং অজুহাত দেখান হইয়াছে যে, সমূদয় লক্ষণ পূর্ণ হয় নাই। এখনও মানুষ এই চির-প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতেছে। কাহারও অস্বীকার রোধ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। তবে আমি এই কথা বলিতেছি, তাহারা আমার কথা শুনার পর উত্তর দিক। অনর্থক কথা সৃষ্টি করা ধর্মপরায়ণতার বিরোধী। নবীগণের সত্য-মিথ্যা বুঝিবার যে নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই আন্দোলনের পরীক্ষা কর। তারপর দেখ সত্য কোন দিকে।" (তবলীগে হক, পৃ:৪৩)।

(চলবে)

কাদিয়ান ভ্রমণের স্মৃতিকথা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

পাঞ্জাবের কাদিয়ান ছোট একটি গ্রাম তবে অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বে খুবই বড়, অপরিসীম ও উল্লেখযোগ্য। কল্যাণমন্ডিত এ গ্রামের কীর্তিমান পুরুষ নবী পাক (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তান হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জীবনাদর্শকে জান ও তাঁর রেখে যাওয়া স্বর্গ স্বীকৃত পবিত্র স্থাপনাসমূহ দর্শন পূর্ব সেখানে নৈতিক দায়িত্ব। আর আহমদীদের বেলায় তো এর গুরুত্ব বলারই অপেক্ষা রাখে না। অতএব সেই তাগিদের তাড়নায় খাকসার সস্ত্রীক গত ১৭ ডিসেম্বর (২০১৬) মৈত্রী ট্রেনে করে ১২২তম সালানা জলসায় (জলসার শুরুর বয়স ১২৫ বছর) অংশগ্রহণের জন্য টিকেটের তথ্য মূলে ঢাকা-কাদিয়ান ২০৩৫ কিমি. সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ২১ ডিসেম্বর বিকাল ৪-৩০ মিনিটের সময় স্বপ্নের স্থান কাদিয়ান পৌঁছি। মাঝখানে কলকাতার মসজিদে ২ দিন যাত্রা বিরতী। এবার বিগত বছরের চেয়ে অনেক বেশী বাংলাদেশী কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রহণ করেছে। সব অংগসংগঠনের সদস্য মিলে ১৪৬ জন। ১৭ তারিখ সন্ধ্যায় আমরা কলকাতার চিতপুর রেল স্টেশনে পৌঁছলে পর স্থানীয় জামাতের একনিষ্ঠ খাদেম জনাব নাসিম সাহেব এসে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তার দুই কাঁধে ও দুই হাতে দুটি করে এবং পিঠে একটি বোচকা তুলে প্রিপেইড টেক্সিতে করে সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিটের সময় (স্থানীয় সময়) আমাদেরকে কলকাতা পার্ক ষ্ট্রিট এলাকার মসজিদে নিয়ে এলেন। আমাদের লাগেজ তিনি আমাদেরকে ধরতে দিলেন না। জামাতের উপস্থিত ভাইদের সাথে কুশলাদি বিনিময়ের পর রাতের খাবার খেয়ে নিলাম।

অতঃপর ওপরে গিয়ে দেখলাম আরো প্রায় ১৫-২০ ৭ন বাংলাদেশী ভাই-বোন গত ৩ দিন থেকে এখানে ভি আই পি-এর আদরে খাওয়া থাকা করছেন। থাকা খাওয়া ও গোসলাদির যথাসম্ভব আরামদায়ক ব্যবস্থা তারা আমাদের জন্য করেছেন। ৪/৫ জন আনসার খোদ্দাম সকাল সন্ধ্যা আমাদেরকে অত্যন্ত খোশ মেজাজে সেবা দিচ্ছেন। আরাম কষ্টের খবরাখবর নিচ্ছেন। সার্বিকভাবে বিষয়টি তদারক করছেন স্থানীয় জেলা আমীর মোহতরম জাফর আহমদ সাহেব। কলকাতা হাওড়া স্টেশন হতে ১৯ ডিসেম্বর তারিখ যাত্র করে ২১ তারিখ সকাল ১১টার সময় আমরা অমৃতসর ও তথা হতে পুনরায় ট্রেনে করে বাটলা হয়ে বিকাল ৪টার সময় কাদিয়ান স্টেশন ও ৪.৩০ মিনিটের সময় জলসাগাহে পৌঁছি। তাদের ব্যবস্থাপনায় তারা আমাদেরকে প্রায় এক কিমি. দূরে গেষ্ট হাউজে পৌঁছে দিলেন। গেষ্ট হাউজ বড় চমৎকার মসজিদ আনোয়ার ও জামেয়ার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ রেজিষ্ট্রেশন সেরে খাওয়া দাওয়া করলাম। মোহতরম মাওলানা সালেহ্ আহমদ ও আবুল খায়ের চট্টগ্রাম আমাদেরকে এসব প্রাথমিক কাজ সারার ব্যাপারে নিগরানী করেছেন। মাওলানা সাহেব আমাদেরকে দিল্লী ফেরার টিকেট, হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানা যাওয়ার জন্য ভাল গাড়ী ও কাদিয়ানের খুটিনাটি সব কিছু দেখার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে এর বিনিময়ে প্রভুত কল্যাণ দান করুন।

প্রাথমিকভাবে কাদিয়ানের অত্যন্ত বরকতমন্ডিত স্থাপনাসমূহ যেমন– মসজিদ মোবারক, মসজিদ আকসা, বায়তুদ দোয়া, হুজরাহ, বায়তুদ যিকর ইত্যাদির অবস্থান জেনে নিলাম। এখনও জলসায় আগমনকারী মেহমানদের ঢল আসতে শুরু করেনি। সুতরাং সুযোগ আছে যেনে উল্লেখিত পবিত্র ও কল্যাণমন্ডিত কক্ষ সমূহে ও মসজিদ মোবারকে ভুকরে কান্নায় দুই রাকাত করে নামায পড়ে নিলাম। বন্ধুদের যারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে খাকসারের নিকট দোয়ার আরজ করেছিলেন তাদের জন্য স্বীয় পরিবারের আধ্যাত্মিক কল্যাণ

লাভের উদ্দেশ্যে অশ্রুঝড়া চিত্তে বেকারার খোদার কাছে দোয়া করে নিলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে কক্ষের দু'দিকে দু'টি দোয়াত রেখে পায়চারী করে করে "বারাহীনে আহমদীয়া" নামক সুবিখ্যাত কিতাব রচনা করেছেন, যে কক্ষে ছয়মাস স্বল্প পানাহারে বিরতীহীনভাবে সিয়াম সাধনা করেছেন আর যে জানালা দিয়ে রোযা রাখার খাবার নিত্যদিন সন্ধ্যায় তিনি এক অজানা অচেনা ফকীরকে দিয়ে দিতেন, যে কক্ষে রাল কালির ছিটার অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল সেসব কক্ষগুলি খুরে খুরে, দেখলাম। অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদলাম। আর দু'রাকাত করে নামায পড়লাম। বাসমতি চালের ভাত যার প্রতিটির দৈর্ঘ অর্থ ইঞ্চি এবং সুস্বাদু ডাল দিয়ে প্রধান লঙ্গর খানায় রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। মাগরিব ঈসার জমা নামায মসজিদ মোবারকে পড়লাম। লক্ষ্য করলাম বিভিন্ন দেশ হতে, ভারতে বিভিন্ন অঞ্চল হতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পোশাক, রং ও চেহারার লোক দলে দলে জলসায় আসতে শুরু করেছে। তাদের সাথে কুলাকুলি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কেবল তাদের আনইরকতা ও আসসালামু আলাইকুম ও ওয়ালাইকুম সালাম একটুকুনই বুঝা যায়। এতদ্ব্যতীত আর কোন কথা বুঝা যায় না। কোলাকুলিতে যে আন্তরিকতার প্রচন্ড টান ও হৃদ্যতার অসম্ভব আকর্ষণ রয়েছে তা বুকে চেপে ধরার কায়দায় সহজেই অনুভব করা যায়, এর উদাহরণ অ-আহমদী আপন ভাইয়ের কোলাকুলির মধ্যেও পাওয়া অসম্ভব।

২২-২৩ ডিসেম্বর মনের স্বাদ মিটিয়ে কাদিয়ানের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত স্থাপনাসমূহ বেহেশতি মাকবেরা, ২৭ মে ১৯০৮ সালে কুদরতে সানীয়া শুরুর স্থান যা শোভামন্ডিত আকারে সংরক্ষিত আছে তা তৃপ্তিভরে দেখে নিলাম। এরপরও মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কক্ষ হুশিয়ারপুর ও ২৩ মার্চ/১৮৮৯ সালে বয়াত গ্রহণকৃত হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের লুধিয়ানা শহরের বাড়ীর সেই কক্ষ দর্শন না করলে তো আর তৃপ্তি মিটছে না। আকাঙ্খা ও বাসনা পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। যা দেখার জন্য সেই ছোট বেলা হতেই মন ও আত্মা সব সময়ই কাঁদতো। ২৪ তারিখ এক আহমদী ড্রাইভার ভাই এর বিলাসবহুল গাড়ী ভাড়া রে (তিনি নিজেই এর চালক) মিরপুরবাসী মামুনুল হক, জাবের ও তার ভাবী রোজি আক্তার গাজীপুরের আব্দুল কুদ্দুস সাহেব ও খাকাসার স্বীয় স্ত্রীসহ সকাল ৯টার সময়ে দোয়া করে লুধিয়ানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। কাদিয়ান হতে হুশিয়ারপুর ৫০ কিমি. ও একই দিকে লুধিয়ানা ২৫০ কিমি.। প্রশস্ত রাস্তা। জ্যামের কোন বিরম্বনা নেই। শীতের ঝকঝকে সকাল ১০০ মিমি. বেগে বিরতীহীনভাবে গাড়ী চলছে। গাড়ীতে কোন ঝাকুানি নেই, ধুলিবালী নেই, গতির কোন স্থবিরতা নেই, শাই শাই চলছে। সময়ের মধ্যেই আমরা হুশিয়ারপুর ছোট এক শহরে এসে পৌঁছলাম।

বহুদিনের পুরাতন জরাজীর্ণ একটি ঘর। হুযূর আকদাস (আ.)-এর দোয়া করার কক্ষটি রেখে বাকী সবটুকু গৃহের পুনঃ সমকারের কাজ চলছে। চতুর্দিকে ভাঙ্গা ইট-কাঠ-বালি-কাদা পরে আছে। খুবই সরু সিড়ি। কষ্ট করে সেই সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। পুনরায় সরু শিড়ি বেয়ে মূল কক্ষে যেতে নীচে নামতে হয়। আমরা নচিে নামলাম। কক্ষে বিছানানো লাল কার্পেটে ২ রাকাত নামায পড়লাম ও কাতর চিত্তে দোয়া করলাম। ছবি উঠালাম। এই কক্ষেই ৪০ দিন ক্রমাগত রোযা রেখে ও নিবিড় দোয়ার বদৌলতে হুযূর (আ.) মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত শুভ ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্ত হন। এ কারণেই এ কক্ষটি পুণ্য বিবর্জিত ও আহমদীয়াতের ইতিহাসে মশহুর হয়ে আছে। এ খ্যাত স্মৃতিকে উত্তমভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক মেরামতের কাজ চলছে। হুশিয়ারপুরের নিবাসী মোয়াল্লেম মোহতরম নাসিম আহমদ তাহের সাহেব এ কাজের তদারকী করছেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর স্ত্রী ও ছেলের সাথে অতীব মহব্বতপূর্ণ ভালবাসায় ভাব বিনিময় হলো। পরে লুধিয়ানায় হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়ী গেরাম, যে কক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে ৪০ জন পুণ্যবান পুরুষের প্রথম বয়আত গ্রহণ করেন। তিনি (আ.) একজন একজন করে ডেকে এনে পৃথক পৃথকভাবে ৪০ জন সাথীর বয়আত নেন, এর মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত হাফিজ মাওলানা হেকিম নূরুদ্দীন (রা.), আহমদীয়া জামাতের প্রথম খলীফা যাঁর মেয়াদকাল ১৯০৮–১৯১৪ সাল। সেই কক্ষটিও একই চিন্তা-চেতনায় ব্যাপকভাবে মেরামত কাজ চলছে। এরই ফাঁকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া মায়ানমারের কতক ভাই ও বোন এসে এখানে উপস্থিত হলেন। সবাইকে সাথে করে আমরা মোয়াল্লেম (উড়িষ্যা নিবাসী) মোহতরম আইয়ূব আলী খানের ইমমতিতে যোহর-আসরের বা-জামাত জমা নামায পড়ে নিলাম। নামাযে আমাদের সাথে মোয়াল্লেম দিলসাব আহমদ সাহেবও ছিলেন। তারা দুজন এখানকার কাজের তদরাকী করছেন। নামায শেষে দোয়া করা হলো। ছবিতে তোলা হলো। মোয়াল্লেমদ্বয় আমাদের কাছে পরিদর্শন খাতা নিয়ে হাজির। আমরা সবাই একে-একে মন্তব্য লিখে খাতায় স্বাক্ষর করলাম। খুবই আত্ম তৃপ্তি লাভ করলাম। মহব্বতপূর্ণ ভালবাসায় সবার সাথে কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় করে তথা হতে বিধায় নিয়ে লুধিয়ানা বাজারে কিছু কিনাকাটা ও দুপুরের খাবার সেরে গাড়ীতে চড়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্র করলাম। স্বীয় নয়নদ্বয়কে এই বলে শান্তনা দিলাম, "হে আমার চক্ষুদ্বয়! তুমি স্বর্গের সুধামন্ডিত স্থানসমূহ দর্শন করেছ। সুতরাং তুমি সার্থক। এবার তুমি দৃষ্টিহীণ হয়ে যাও তাতে আমার আর দুঃখ থাকবে না। তুমি আমার হয়ে খোদার কাছে এই পুণ্য কর্মের সাক্ষ্য দিও"। রাত ৯টা নাগাদ আমরা কাদিয়ান আস্তানায় এসে পৌঁছলাম। ড্রাইভার আসাদ চিমা সালাম বিনিময় করে বিদায় নিলেন।

২৫ তারিখ সকাল ৯টার সময় ভাইপো জাহাঙ্গীর ও তদীয় স্ত্রী, জনাব কুদ্দুস সাহেব (গাজীপুর) আমরা স্বামী-স্ত্রী অমৃতসরে বাবা গুরু নানকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত উপসনালয় দর্শনের জন্য বাসে করে তথায় গেলাম। পথে বাটালায় বাস পরিবর্তন করতে হয়। বেলা ১১.৩০ মিনিটে সেখানে পৌঁছলাম। মাথায় হলুদ বর্ণের রুমাল বানতে হয়। নতুবা ভিতরে গমন না-জায়েজ। অগত্যা ১০ টাকা করে

রুমাল কিনে নিয়ে মাথায় পরিধান করলাম। মূলত ইহা একটি প্রহসন অর্থাৎ ব্যবসা। ভিতরে বিশাল বড় এলাকা। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। আমরা ভিন দেশী। যে কোন সময় যে কোন ভাবে হারিয়ে পথ ভ্রমের আশংকা রয়েছে। সুতরাং এ জনসমূদ্রের ভিড় ঠেলে স্মৃতি সৌধের সব কিছু খুটিনাটি৫ দেখা ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আর একদিনে তা হবে না। যতটুকু সম্ভব সহজভাবে ঘুরে কিছু দেখলাম। চতুরদিকে বিস্তর এলাকা জুড়ে পানি। মাঝখানে বাবা সাহেবের স্বর্ণ মন্দির। সবটুকুই স্বর্ণ-বর্ণ। চতুরদিকে পানিতে রং-বেরংএর বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সাঁতার কাঁটছে। মন্দিরে কারোকার্য চমৎকার। মনমুগ্ধকর সৌধ। বলা যায় চিত্তাকর্ষক স্মৃতি সৌধ। ভক্তরা নানান কায়দায় তাদের স্ব স্ব মন বাসনা পূরণ করছে। কেউ ভাবের গান গাছে, কেউ বক্তৃতা দিচ্ছে, কেউ খাবার কিনে হজাহ খানয় দিচ্ছে, কেউ সেই খাবার ভক্তি আপ্লুত চিত্তে পূজা করার কায়দায় মন-মনবাসনা পুরণের উদ্দেশ্যে খাচ্ছে। কেউ মাছের ময়লা মিশ্রিত পানি ভক্তি ভরে পান করছে। প্রচন্ড শতিে সেই পানিতে কেউ নাইছ, কেউ বাদ্যবাজনা বাজাচ্ছে। কেউ নেচে নেচে আহাজারি করছে। বিভিন্ন কোণা হতে বিভিন্ন কারণে মাইক বাজছে, এসবের প্রচন্ড আওয়াজ। কানফাটা হৈ চৈ। কেউ কারো কথা শুনতে পারছে না। কাউকে কিছু বলতে হলে কান ও মুখ কাছাকাছি নিতে হচ্ছে। তবে সবাই শৃংখলামত যার যার কাজ করছে। এখানে কোন অনাকাঙ্খিত গোলযোগ নেই। এমনিভাবে বিদাত কার্য সিদ্ধির মাধ্যমে বাবার কল্যাণ-লাভের উদ্দেশ্যে ও ভক্তরা ধর্মকর্ম করছে। এ অদ্ভুত চিত্রের কার্যাদি দর্শন করে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা আমাদের গেষ্ট হাউজ কাদিয়ানে ফিরে এলাম।

আগামী কাল ২৬ তারিখ জলসার প্রথম দিন। পূর্বে যেভাবে শুনে এসছি সে রকম পাগলা শীত এবার নেই। এখানে সকালেই জলসা উপভোগ করবেন। কিন্তু খোদার অলৌকিক ব্যবস্থাপনায় এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গের। ২৬ তারিখ সকালে প্রচন্ড কুয়াশা দিয়ে কাঁপানো শীত সবাই বলছে, "আজ কাদিয়ানের চিরাচরিত স্বভাবে শীত অনুভূত হচ্ছে"। সবাই বস্তা ভরা কাপড় গায়ে জড়িয়ে জলসা গায়ে গেল। স্টেজ দেখা যাচ্ছে না বক্তকেও দেখা যাচ্ছে না। এমনি স্বভাবের কুয়াশা আর শীত। জলসা গায়ে ঢুকলাম। ৫টি পয়েন্টে ৫ রকম কায়দায় নিরাপত্তায় দায়িত্ব খাদেমগণ আমাদেরকে শুনার জন্য হেডফোন লাগিয়ে দিলেন। চমৎকার শব্দ সম্ভার ও বোধগম্য সহজ সরল বাংলা অনুবাদে আমরা প্রত্যেক বক্তার প্রতিটি শব্দ আপ্লুত হয়ে তন্ময় চিত্তে শ্রবণ করলাম। এত সুন্দর বাংলা যা বুঝতে আমাদের মোটেই কোন কষ্ট হয় নি অনুবাদককে ধন্যবাদ। বেলা ১০-১১টা নাগাদ কুয়াশা কেটে গেল। রোদ শুরু হয়ে গেল। গা গরম হয়ে উঠছে। শ্রোতাগণ একের পর এক গায়ের জামা খুরতে শুরু করছে। প্রথম দিনের প্রথম সেশন শেষ হলো। সবাই খাওয়ার জন্য ছুটতে শুরু করল। শুরু হলো প্রতিযোগিতা। খাওয়া শেষে কে কার আগে এসে পুনরায় নিজ নিজ পছন্দ মত আসনে বসতে পারে সে মানসে। খকসার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে জলসা গায়ের দোকান হতেই কিছু খেয়ে নিজ আসনে বসে পড়লাম। এমনি করে জলসার তিন দিনের আড়াই দিন কেটে গেল, তৃতীয় দিনে শেস সেশনে আমাদের পবিত্র নেতা হুযূর (আই.)-এর কল্যাণমন্ডিত ভাষণ হবে। সবাই খানা-পিনার কাজ যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে যার যার আসনে আসীন হরেন। প্রায় একঘন্টা নাগাদ হুযূর (আই.) শ্রোতাগণের উদ্দেশ্যে মহামূল্যবান ভাষণ প্রদান কররেন। মন্ত্রবৎ তন্ময় বসে শ্রোতাগণ সেই ভাষণ শ্রবণ করলেন। অশ্রুত ঝরা চোখে বুকভরা ভালবাসায় সবাই সেই বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করলেন। ক্ষণে ক্ষণে নাড়ার কণ্ঠ ফাটা আওয়াজ। কেউ দু'হাত তওল নিনাদকণ্ঠে "কাদিয়ান দারুল আমান" ইত্যাদি নাড়ায় জলসাগকে উচ্ছ্বাস মুখর করে তুলছে। পরিশেষে অশ্রুঝরা কান্নায় দোয়ার মাধ্যমে শেষ হলো ১৬ হাজার আহমদী ভাই বোনের মিলন মেলা ১২২তম কাদিয়ানের জলসা সালানা। ৪২টি দেশের প্রতিনিধি ছিল এই জলসায়।

উল্লেখ্য যে, এ বৎসর পাকিস্তানের আহমদীদের জলসায় আগমন হুযূর (আই.)-এর পক্ষ থেকে নিষেধ করা ছিল বিধায় পাকিস্তান হতে কোন আহমদী জলসায় আগমন করেনি। মসজিদ আনোয়ার হতে মসজিদ মোবারক পর্যন্ত এক কিমি. রাস্তার দুপাশ আলোকশয্যা করা হযেছে। মসজিদ মোবারক, আকশসা ও মিনারাতুল মসীহ্ রং-বেরং এর বাতিতে ঝলমল আরোয় বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হযেছে। হাজারো মরিচা বাতির আরোক শয্যঅ শত শত আহমদী ভাই-বোন গলায় আইড কার্ড ঝুলিয়ে কাদিয়ানের বাজারে বাজারে বাজার করছে। এখানে যেকোন কাপড়ই তুলনামূলক ভাবে সস্তা। রাস্তার দু-পাশে গরম কাপড়সহ বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসা দোকান হতে হরেক রকম লোক হরেক রকম পণ্য কিনছে। একদল যাচ্ছে আর একদল আসছে। আনন্দের উজ্জ্বল ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। শিখ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বলছে, "ইহা মির্যায়ীদের ধর্মমেলা।" তারা এ সুযোগে দোকান সাজিয়ে হরেক রকম পণ্য বিক্রি করছে।

লাকড়িতে আগুন দিয়ে একদল খাদেম শীত নিবারণ করছে আর রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। আরেক দল রান্না করছে। অন্য একদল রুটি বানানোর যন্ত্রে ঘন্টায় আটশত রুটি তৈরী করছে। কেউ অবসর নেই। আরেক দল খাদেম বিভিন্ন গুদামের সংরক্ষিত হাজার হাজার কম্বল-লেপ হতে গাড়ীতের করে বিভিন্ন আস্তানায় তা সরবরাহ করছে। সে এক এলাহী কান্ড। ভোর ৫ টায় শত শত জন তাহাজ্জুদ পড়ার তাগিদে আপাদমস্তক গরম কাপড় জড়িয়ে মসজিদ মোবারক, আকসায় কিংবা কেউ মসজিদ আনোয়ারে ছুটে চলছে। অধীক পুণ্যতা অর্জনের বাসনায় অলম্পিক মাঠের ন্যায় প্রতিযোগিতার যেন এক মহাসমাবেশ, এসব তত্ত্বকথা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। যিনি চাক্ষুষ দেখেছেন তিনিই কেবল এসবের অসম্ভব সৌন্দর্য ও স্বাদ অনুভব করতে সম্ভব হয়েছেন। আর যিনি কখনও যাননি বলা যায় তার দৃষ্টি অন্ধই রয়ে গেল, হৃদয় সুপ্তই থাকল।

আসক্তি সৃষ্টি করায় শিশুদের জন্য মোবাইল ফোন ক্ষতিকর

মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম হাফিজ

যতগুলো যোগাযোগ মাধ্যম আছে তার মধ্যে মোবাইল ফোন অন্যতম। কারণ, এ মোবাইল ফোন ক্রয় করতে, বেশী টাকার প্রয়োজন হয় না এবং এটি ব্যবহার করতে বিশেষ কোন প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। কারণ এটি ব্যবহার করা সহজ। এক দুইবার ব্যবহার করা দেখলেই যে কোন শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ ব্যবহার করতে পারে। সবাই এটি ব্যবহার করতে আগ্রহী হন। কারণ যে কোন মুহূর্তেই লক্ষজনের সাথে কম খরচে এবং কম সময়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এ মোবাইল ফোনের যে দাম তা যে কোন শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব। একটি সিম কিনে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে মোবাইলে প্রবেশ করালে তা দিয়ে দিব্যি কথা বলা যায়। শুধু তাই নয় এ মোবাইল ফোন দিয়ে গান শোনা যায়, ছবি দেখা যায়, ছবি তোলা যায়, ইন্টারনেট চালানো যায়, ফেসবুক চালানো যায়, ই-মেইল পাঠানো যায়, এস এম এস পাঠানো যায় ইত্যাদি বহুমুখি কাজ করা যায়।

মোবাইল ফোনের ভাল দিক যত আছে, ক্ষতিকর দিকও কম নয়। এটি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। এবং তাদের মধ্যে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে শিশুরা। শিশুরা যেভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, তার মধ্যে একটি হলো, তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেয়া। যদি শিশু একবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে শিখে তাহলে তাকে আসক্তি থেকে ফিরানো সম্ভব হয় না। মোবাইল ফোনে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে লেখা পড়ায় মনোযোগী হয় না। বিদ্যালয়ে নিয়মিত যায় না এবং যার কারণে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে না। মোবাইল ফোনে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে শিশুর আচরণ হয়ে ওঠে নেতিবাচক। বড়দেরকে তারা কোন সম্মান করে না এবং তাদের কোন আদেশ নিষেধ মানে না। মোবাইল ফোনে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে শিশুদের আচরণ খিটখিটে হয়ে যায়। এমনকি গেম্‌স, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি ইস্যুতে সময় কাটানোর জন্য একজন মানুষ হিসাবে যে কাজগুলো না করলেই নয়, যেমন– সময় মতো খাওয়া দাওয়া, নিয়মিত নামায কায়েম করা, সময় মত বিশ্রাম নেয়া, সময় মতো খেলাধুলা করা, ধর্মীয় প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকা ছাত্র হিসেবে সময়মত লেখাপড়া করা, এই কাজগুলোও শিশুরা সময় মতো করে না একমাত্র মোবাইল ফোনে আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। মোবাইল ফোন একদিকে যেমন শিশুদের আকৃষ্ট করছে এবং তাদের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে, ঠিক তেমনি তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের আর্থিক অনটনে ফেলছে। ফলে মোবাইল ফোন ব্যবহারের খরচ যোগাতে অনেকে চুরি, রাহাজানি এবং অন্যান্য খারাপ কাজে পা বাড়াচ্ছে। যার ফলে পরিবারে, সমাজে এবং দেশে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

সব অভিভাবকদের মনে রাখা উচিৎ, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুর এখন লেখাপড়া করার বয়স। তার সঠিক ক্যারিয়ার গঠনের সময়। শিশু যেন তার মূল্যবান সময়টুকু ভালভাবে কাজে লাগাতে পারে, সেদিকে সকল অভিভাবকদের দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। বাউল সম্রাট লালন শাহ্ বলেছেন "সময় গেলে সাধন হবে না" মোবাইল ফোন ব্যবহার করার সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল্যবান সময় গেলে তা পাওয়া যাবে না। তাই সময় কাজে লাগানো সকলের উচিৎ। আপনার শিশুর প্রতি আপনি খেয়াল রাখুন। আপনার সচেতনতাই পারে আপনার শিশুকে আসক্ত মুক্ত রাখতে।

কৃতি ছাত্রী

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমত ও কৃপার ফলে আমাদের প্রথম সন্তান তাহিরা হোসেন বুশরা ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত পি.এস.সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এবং ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ্। সে একজন ওয়াকেফাতে নও সন্তান। তার ওয়াকফে নও নং- বি/১২২৪৯। বর্তমানে সে হবিগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত বি.কে.জি.সি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। জামা'তের সকলের নিকট তার সুস্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য আন্তরিক দোয়াপ্রার্থী।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন এবং
শামসুন্নাহার বেগম

নবীনদের পাতা–

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মোহাম্মদ আতা এলাহী শুভ

"ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামিন।"

অর্থাৎ-"আর আমরা তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল এক রহমত রূপেই পাঠিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৮)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মানবতার মুক্তির অগ্রদূত। তিনি ছিলেন বিশ্বের সকল মানবজাতির জন্য আশির্বাদ ও রহমত স্বরূপ। তাঁর আগমনের পূর্বে মানবাধিকার যেখানে লুণ্ঠিত ছিল, তাঁর (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি (সা.) যখন নবুওয়তের দাবি করলেন এবং মক্কার নেতা আবু জাহল যখন তাঁর (সা.) খুব বিরোধিতা শুরু করে দিল এবং লোকদের কাছে বলতে লাগল যে, "কেউ তাঁর (সা.)-এর কথা মানবে না। বরং যতটা পারবে তাকে লাঞ্ছিত করবে। সে সময় এক ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল আবু জাহলের কাছ থেকে তার কিছু পাওনা আদায় করার জন্য। 'সে ব্যক্তি আবু জাহলের কাছে তার পাওনা চাইল। কিন্তু আবু জাহল তার পাওনা আদায় করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর কিছু লোক এ ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহায্য চাইতে পরামর্শ দিল। ওদের উদ্দেশ্য ছিল মুহাম্মদ (সা.)-কে জব্দ করা। তারা মনে করেছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইবে না। কেননা তখন মক্কার লোকেরা বিশেষভাবে আবু জাহল তাঁর (সা.) প্রচন্ড বিরোধিতা করছিল। আর এভাবে তিনি (সা.) মানবাধিকার রক্ষার শপথ ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে লোকটিকে সাহায্য করার জন্যে যদি তিনি (সা.) আবু জাহলের নিকট যান, তবে আবু জাহল তাঁকে লাঞ্ছিত করেই ছাড়বে এবং ঘর থেকে বের করে দিবে। অতঃপর লোকটি যখন মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট আবু জাহলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল, তিনি (সা.) লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং আবু জাহলের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। আবু জাহল ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন, তার পাওনাদারসহ মুহাম্মদ (সা.) তার দরজায় দাঁড়ানো। মহানবী (সা.) তাকে বললেন, "এই ব্যক্তির অমুক অমুক পাওনা তোমাকে দিতে হবে, দিয়ে দাও"। আবু জাহল কোন প্রকার উচ্চ বাক্য না করে লোকটির পাওনা পরিশোধ করে দিল। এরপর শহরের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাকে ধরল, "আবু জাহল! তুমি আমাদের কাছে খুব তো বড়াই করে বল, মুহাম্মদকে লাঞ্ছিত কর, তার সাথে কোন সম্পর্ক রেখো না, অথচ তুমি নিজেই তার কথা মতো কাজ করলে এবং সম্মান প্রতিষ্ঠা করলে।" তখন আবু জাহল বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমার স্থলে যদি তোমরাও হতে তাহলে তোমরা একই কাজ করতে। আমি দেখলাম, মুহাম্মদের ডানে ও বামে দুটি পাগলা উট দাঁড়িয়ে আছে এবং সেগুলো আমার ঘাড় মটকে আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত।' (ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ-১৩৬)।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ যা তিনি মুযদালেফার ময়দানে হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একমাত্র ইসলামের শিক্ষাই অনুসরণযোগ্য যা পালনে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং যার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব।

তিনি (সা.) মানুষের মঙ্গল, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই তিনি বিশ্ববাসীর সামনে এমন শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর (সা.) আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুন।

মক্কা বিজয়ের পর মক্কাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) খুতবা দেয়ার পরে তিনি সমবেত লোকদের দিকে তাকালেন, অত্যাচারী কুরায়শরা তাঁর সামনেই ছিল। তাদের মধ্যে তারাও ছিল যারা ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সর্বাগ্রে ছিল। যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বারি বর্ষণের ন্যায় গালি দিত, তারাও ছিল। তারাও ছিল যারা আঁ-হযরত (সা.)-এর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল। তারাও উপস্থিত ছিল যারা ওয়াজের সময় মহানবী (সা.)-এর গোড়ালি রক্তাক্ত করে দিত এবং রক্ত পিপাসু ছিল। যারা মুসলমানদেরকে উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে তাদের বুকের ওপর আগুনের ছেকা দিত। রহমতের বাদশাহ (সা.) এসব ভীত সন্ত্রস্ত লোকদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি কিছু জান? আমি তোমাদের কি করবো?" এই লোকেরা যেহেতু অত্যাচারী ও নির্দয় ছিল। কিন্তু তারপরও বলে উঠলো, "আখু কারীমুন ওয়া ইবনু আখিন কারীমুন"। আপনি আমাদের দয়াশীল ভাই, দয়াশীল ভাইয়ের ছেলে। তিনি (সা.) বললেন, "লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইযহাবু ফাআনতুমুত্ তালাকাউ"। তোমাদের কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। আজ থেকে তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত। (সীরাতুন নবী, আল্লামা শিবলী)।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, "সুতরাং এই ছিল রসূলে করীম (সা.)-এর ক্ষমার দৃষ্টান্ত যা বিরোধিদের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে একটি কঠিন বিষয় ছিল, কখনো কি এভাবে ক্ষমা করা যেতে পারে? কিন্তু যখন তাঁর (সা.) উত্তম ব্যবহার তারা দেখল তখন এর ফল কী দাঁড়ালো, বিরোধিরা প্রকৃত ধর্মকে গ্রহণ করলো। যদি আজ মুসলমানরা এই বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হতো তাহলে ধর্মের বাণীকে বুঝতে অনেক উন্নতি সাধন করতে পারত। হয়ত এই সকল লোকেরা কট্টরপন্থী দলের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে এই আদর্শের ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম হতো, যা আমাদের সম্মুখে আমাদের নেতা ও মুরশেদ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) রেখে গেছেন। আমীন সুম্মা আমীন।

সংবাদ

বিভিন্ন জামাতে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৫/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আহমদী পড়াস্থ মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আয়োজনে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এই মহতী জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চলনায় ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ মঞ্জু, খাদেম এবং নযম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ জসিম আহমদ ও ডা: মোবাশ্বের আহমদ। বক্তৃতা পর্বে "পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশনা" বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন জনাব মুহাম্মদ আলামিন আহমদ, জেলা নাযেম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। "হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরমত সহিষ্ণুতা" প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন জনাব মৌ. এস, এম, আবু তাহের মোয়াল্লেম। "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাতুল্লিল আলামীন" বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেন জনাব জহির উদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। সবশেষে সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ করা হয়। এই জলসায় একজন জেরে তবলীগ মেহমান সহ মোট ১২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

আনসারুল্লাহ্ খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার উদ্যোগে গত ২৫-০৩-২০১৭ তারিখ শনিবার সকাল ১০৩০. মিনিটে জনাব এস এম আনসার উদ্দিন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদ কমপ্লেক্সের লাইব্রেরীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা আরম্ভ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্র থেকে আগত মোহতরম ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইমতিয়াজ আলী সাহেব ও মুরব্বী সিলসিলাহ জনাব শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব শেখ মোহাম্মদ ওমর, এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব মনিবুর রহমান আসিফ। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন আদর্শ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা প্রদান করেন মাওলানা মুহাম্মদ রইস আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। পরবর্তী বক্তৃতা খাতামান্নাবীয়ীন (সা.) এর পরমত সহিষ্ণুতা বিষয়ের ওপর প্রদান করেন কেন্দ্র হতে আগত শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। এরপরে প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করেন এবং সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলাহ, রইস আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। এ জলসাতে বয়আত গ্রহণ করেন ৫ জন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন জনাব এন, এ শাহীন আহমেদ। অতঃপর দুপুর ২টায় যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ার পর দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। এরই মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত জলসাতে মোট উপস্থিত ছিল ১৬৩ জন।

এন, এ শাহীন আহমেদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত মার্চ মাস ২০১৭ তারখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার বিভিন্ন হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে ঢাকার হালকায় আলাদা আলাদা ভাবে সীরাতুন নবী (সা.) দিবস পালন করা হয়। হালকাগুলো হলো বকশিবাজার, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, পলাশপুর, মগবাজার, মতিঝিল, মহাখালী ইত্যাদি। অধিকাংশ অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া দোয়া কবুলিয়ত, মক্কা বিজয়, ক্ষমা, মিরাজ, ও মহানবী (সা.) মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১২০ জন লাজনা, ৬ জন নও মোবাঈন, ১৩ জন নাসেরাত ৪৭ জন জেরে তবলীগসহ মোট ১৮৬ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করে। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শাহজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর-ঈশ্বরদী

গত ২৯/০৩/২০১৭ তারিখ বুধবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগর/ঈশ্বরদীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন, রেজওয়ানা। নারী জাতির ওপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগ্রহের ওপর আলোচনা করেন লাজলী জামান। মর্তজারা বেগম, আলোচনা করেন শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর এবং বদরের যুদ্ধের ওপর আলোচনা করেন জ্যোতি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন খাতামান নাবীয়িন এর ওপর আলোচনা করেন ফাল্গুনী হাবীব। 'দরূদ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' এর ওপর আলোচনা করেন আফছানা আরা। সভানেত্রীর বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

রওশনয়ারা

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২০/০২/২০১৭ তারিখ যথযোগ্য মর্যাদার সাথে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। ২০/০২/২০১৭ তারিখ বাদ মাগরিব মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ এ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনা সোলায়মান আহমদ, নযম উর্দূ পেশ করেন জনাব ইশতিয়াক আহমদ নির্জন এবং দ্বৈত কণ্ঠে বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব আফতাব আহমদ ও ইশতিয়াক আহমদ ইফতি। দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মোশারফ হোসেন সাহেব এবং এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। প্রবন্ধের বিষয় ছিল যথাক্রমে মুসলেহ্ মাওউ দিবস কি ও দিবসটির গুরুত্ব এবং পবিত্র কুরআনের সেবায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অনুষ্ঠানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন এস, এম, আবু তাহের, মোয়াল্লেম এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এরপর মোহতম মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। উক্ত সভায় ২৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল আউয়াল মাষ্টার

গাজীপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুরের উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারী মসজিদ প্রাঙ্গনে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়, স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব এর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও নযম পাঠের পর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব ইকবাল আহমদ সাহেব, জনাব কবির আহমদ সাহবে মৌ. কামরুল ইসলাম প্রধান এবং প্রেসিডেন্ট সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত দিবসে ৬৭ জন সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান

চানপুর চা-বাগান

গত ২৪/০২/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চানপুর চা বাগান কর্তৃক আয়োজিত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অত্যন্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব হাসেম আহমদ চৌধুরী। এরপর নযম পেশ করেন জনাব ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী, কায়েদ। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের তাৎপর্য এবং মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর অসাধারণ অবদান সম্পর্কিত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেন জনাব রুহুল আমীন রিওন, মুরব্বী সিলসিলাহ্। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চান্দপুর চা বাগান। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৩ জন সদস্য ও দসস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

খুলনার টুটপাড়া হালকা

টুটপাড়া হালকার উদ্যোগে গত ০৪/০৩/২০১৭ তারিখ সময় বিকাল ৫ ঘটিকায় জনাব আনসারউদ্দিন সাহেবের বাসায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব আসিফ আহমদ। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জামাতের আমীর জনাব এস, এম আনসার উদ্দিন সাহবে। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব শেখ আলী আকবর সাহেব। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আমীর সাহেব। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব আবু জাফর। বক্তব্য রাখেন এস, এম আনসার উদ্দিন সাহেব, তিনি তার বক্তৃতায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর সুদীর্ঘ ৫২ বছর খেলাফতের কর্মময় জীবনের বিষদ বর্ণনা করেন। তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র একজন প্রেরিত প্রিয়ভাজন ছিলেন। তার মত কষ্ট

সহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব আহমদীয়া জামাতের প্রাণ পুরষ, জামাতের জন্য যে অবদান তিনি রেখেছেন তা চিরস্মরণীয়। তার জ্ঞানগর্ব আলোচনা উপস্থিত সকলে তন্ময় হয়ে শ্রবণ করেন।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমাদের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন অত্র জামাতের মুরুব্বী জনাব রইস আহমদ এবং তিনি খোদ্দামের প্রতি বিশেষ নসিহত করেন। সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে মুসলেহ মাওউদ (রা.) জীবনাদর্শ মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ শেষ করেন।

কাইজার আলম মানিক

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা

গত ১৬/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ মাগরীব মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ দুলাল মিয়া যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ্, কুরআন তিলাওয়াত করেন এস, এম ইব্রাহীম, নযম এস, এম মহিবুল্লাহ্। বক্তৃতা করেন শামসুদ্দিন মাসুম মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং বক্তৃতা করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ঘাটুরা। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া

ভাতগাঁও

গত ২৪/০২/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ভাতগাঁও মসজিদে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ইশায়াত নূরউদ্দীন আহমেদ শাহ্ এর সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব তারেক আহমদ। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব সালমান আহমদ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর "আপনার সন্ধানে আছি" বাণী বলেন, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, জেনারেল সেক্রেটারী ভাতগাঁও ও রিজিওনাল কায়েদ, মঃখোঃআঃ রংপুর রিজিওন।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দৃষ্টিতে খোদ্দামদের দায়িত্ব এই বিষয়ে বলেন– ইয়ামিন আহমদ কায়েদ, ভাতগাঁও। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে বলেন– মৌ. নূরুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। বাংলা নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ আব্দুল করীম, যয়ীম আনসারুল্লাহ্, ভাতগাঁও। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস কী এবং কেন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন– মোহাম্মদ মনির হোসেন খাঁন, সেক্রেটারী তবলীগ, ভাতগাঁও। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সভাপতি নূরউদ্দিন আহমদ শাহ্, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ইশায়াত, ভাতগাঁও। দোয়া পরিচালনা করেন মৌ. নূরুল ইসলাম। এতে মোট ৭৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

বীরগাঁও

গত ০১/০৩/২০১৭ তারিখ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বীরগাঁও কর্তৃক আয়োজিত মুসলেহ্ মাওউদ দিবস খোদা তা'লার ফজলে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব কামাল উদ্দিন সাহেব প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বীরগাঁও। এরপর পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন লামিসা আক্তার, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর লিখিত নযম দ্বৈত কণ্ঠে পেশ করেন নাফিসা ও লামিসা আক্তার, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেন জনাব জানে আলম এবং মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের তাৎপর্য ও কুরআনের অসাধারণ সেবায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন জনাব রহুল আমীন রিয়ন, মুরব্বী সিলসিলাহ্। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কামাল উদ্দিন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত ২২.০২.২০১৭ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে হুযূর (আই.) এর প্রতিনিধিকে নিয়ে "হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আ.) দিবস" উদযাপিত হলে লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্য ও নাসেরাত ঢাকার সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটি থেকে আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভাগী হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে ১২৪ জন লাজনা, ৯ জন নাসেরাত ও ১৭ জন শিশু ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ১০টি হালকায় দিবসটি পালন করা হয়েছে। এতে উপস্থিত সর্বমোট সদস্য ছিল ১৭৮ জন লাজনা, ৩৩ জন নাসেরাত ২৫ জন শিশু এবং ৮ জন মেহমান।

শাহজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বানিয়াজান

গত ১২.০৩.২০১৭ তারিখ দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ বানিয়াজান এর উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস ও বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রেসিডেন্ট। কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন তাহমিনা আক্তার (পলি) এবং মুসলেহ্

মাওউদ-এর জন্ম, মুসলেহ মাওউদ এর বিভিন্ন সফলতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন মরিয়ম সুলতানা (ইভা)। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

তাহমিনা আক্তার

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর

গত ২৮/০২/২০১৭ তারিখে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন শাহানাজ পারভীন। নযম পেশ করেন আদিতা বুশরা এবং দোয়া পরিচালনা করেন দিলরুবা জামান। বক্তৃতা পর্বে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট দিলরুবা জামান। তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল– '২০ ফেব্রুয়ারীর পেক্ষাপট ও মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দাবি ও রহমতের নির্দেশনা'। দ্বিতীয় বক্তা শাহানা খন্দকার 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জন্ম ও বাল্যজীবন' নিয়ে আলোচনা করেন। তৃতীয় বক্তা সাহানা তুবা 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন। চতুর্থ বক্তা আনোয়ারা বেগম 'নারীর কল্যাণে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং শেষ বক্তা আদিতা বুশরা 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ওপর আল্লাহ্‌র কুদরত ও রহমত' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সবশেষে নযম পাঠ করেন সুইটি জাবের এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহনাজ পারভীন মণি

মিরপুর

বিগত ২০ই মার্চ, ২০১৭ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুরের উদ্যোগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। দোয়া ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়।

সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সরফরাজ আহমদ বন্ধন। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আমীর সাহেব। নযম পাঠ করেন ফিরোজ আলম। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা:) এর ঈমান বর্ধক ঘটনাবলী বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ আব্দুল হান্নান, নায়েব আমীর-১ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মামুনুল হক, সেক্রেটারী তবলীগ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর।

সবশেষে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন হাফেজ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর। মোহতরম আমীর সাহেব সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে আতফাল, খোদ্দাম, আনসার, নাসেরাত ও লাজনা সহ ৩০০ জনেরও অধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

ইফতেখারুল ইসলাম

ধানীখোলা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ধানীখোলায় মহান মুসলেহ মাওউদ দিবস উপলক্ষে এক জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন ধানীখোলা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডা. মোস্তাফিজুর রহমান। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তফাজ্জল হোসেন পাটোয়ারী, এরপর কালামে মাহমুদ থেকে নযম পেশ করেন জনাব হামিদ আহমদ দ্বীপ।

বক্তৃতা পর্বে প্রথমে খাকসার মুসলেহ মাওউদ দিবসের প্রেক্ষাপট এবং মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর মুসলেহ মাওউদ হবার বিষয়ে বক্তব্য দেই। অতঃপর সভাপতি সাহেব মুসলেহ মাওউদের কর্মময় জীবনের উপর বক্তব্য প্রদান করেন ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৩২ জন আহমদী সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে এই দিবসটির ঐতিহ্য অনুসারে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ডাঃ নাজিফা তাসনিম
বি ডি এস (ডি ইউ)
পি জি টি (বি এস এম এম ইউ)
ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী
বি এম ডি সি রেজিঃ 4299
মেডিক্যাল অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন
(বারডেম পরিবারভুক্ত শাখা)
মুখ ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ
চেম্বার ঃ
ইনি ন্যার হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার
কুমারশীল মোড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
মোবাইল : 01711-871473
রোগী দেখার সময় ঃ
প্রত্যহ বিকাল ৪টা - রাত ৮টা
শুক্রবার সকাল ১০টা-দুপুর ১টা ও
বিকাল ৪টা - রাত ৮টা

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন জামাত ও হালকায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়

খায়েরহাট, রাজশাহী

গত ২৩শে মার্চ আসর হতে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবসের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব আলহাজ মোহাম্মদ ইউনুস আলী সাহেবের সভাপত্তিতে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, নযম পাঠ করেন মাহেনুর রহমান কনক। পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন, হাজী মোহাম্মদ আবুল হোসেন মন্ডল মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক আউয়াল, মোহাম্মদ জিন্নাত আলী, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন , আব্দুল খালেক মোল্লা, মোয়াল্লেম ফরহাদ হোসেন এবং সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষন প্রদান করেন। ৪৬ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি সাহেব সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার উদ্যোগে গত ২৩-০৩-২০১৭ তারিখ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস, এম আসার উদ্দিন সাহেব এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব আমীর হামযা আল মাহেদী এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব তানভীর আহমেদ শোভন। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনকালীন সময়ে যুগের লক্ষণাবলী ও এর পূর্ণতা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা, তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক ও জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপদেশাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মুরব্বী সিলসিলাহ মাওলানা রইস আহমদ এবং সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী। সবশেষে সভঅপতি স্থানীয় জামাতের মোহাতরম আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দীন সাহেব জামাতের সদস্যদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপদেশ মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আলোচনার পর এম,টি,এ-তে প্রচারিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে সরাসরি অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মোট ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন, এন, শাহীন আহমেদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৩/০৩/২০১৭ তারিখ যথযোগ্য মর্যাদার সাথে মসীহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। ২৩/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ মাগরিব মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ এ মসীহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব নাছির আহমদ, নযম উর্দু পেশ করেন জনাব ইশতিয়াক আহমদ নির্জন এবং বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ইশতিয়াক আহমদ ইফতি। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব হেদায়াতুর রহমান ভূইয়া, যার বিষয়বস্তু ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম। অনুষ্ঠানে বয়আতের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয় এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা এস, এম, আবু তাহের, মোয়াল্লেম এবং হিজরী চতর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাব এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এরপর মোহাতরম মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। উক্ত সভায় ১৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল আউয়াল মাষ্টার

বটিয়াপাড়া

গত ২৪ মার্চ, ২০১৭ বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব স্বাধীন আহমেদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব সানোয়ার হোসেন। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্ম বল্যঅকাল ও দাবির পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব আক্তারুজ্জামান (পল্টু), মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কতিপয় ইলহাম ও এর পূর্ণতা এবং বিভিন্ন ঐশীগ্রন্থে মুহাম্মদী মসীহ্ এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব ডা: আশিকুর রহমান। এরপর ইমাম মাহ্দীকে মানার গুরুত্ব, যুগের লক্ষণ ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আল আমীন। সবশেষে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণনা ও সমাপনী বক্তৃতা করে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মিরাজুল ইসলাম। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৯ জন পুরুষ ও ১৪ জন মহিলাসহ মোট ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের পূর্বে ২ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা বয়আত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

মিরাজুল ইসলাম

আশকোনা

আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ ফজলে গত ২৪/০৩/২০১৭ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আশকোনা এর যৌথ উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস আশকোনার স্থানীয় মসজিদে উদযাপিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব তুফাজ্জল হোসেন সাহেব প্রেসিডেন্ট, আশকোনা হালকা, কুরআন তেলাওয়াত করেন সাব্বা উদ্দিন ছালমুন। নযম পাঠ করেন জনাব জিকরে এলাহী সাহেব এবং মসীহ মাওউদ ও আহমদীয়া জামাত এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমেদ (কায়েদ আশকোনা মজলিস)।

মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত এ বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন জনাব জাকির হোসেন সাহেব এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন ও আমাদের দ্বায়িত্বাবলী এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মৌলভী এনামুল হক রনি সাহেব।

সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিরাজ উদ্দিন আহমেদ

শৈলমারী

গত ২৩ মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ আসর থেকে বাদ মাগরিব পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শৈলমারীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্) স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু করা হয়।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন শামীম আহমেদ এবং নযম পাঠ করেন জিহাদ আহমদ। এরপর ২৩ মার্চের প্রক্ষাপট ও পটভূমি নিয়ে দীর্ঘ সময় বক্তৃতা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং সংক্ষিপ্ত ও শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব ইউসুফ আলী সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

প্রেসিডেন্ট, শৈলমারী

জামালপুর, হবিগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার-২০১৭ বাদ মাগরীব হতে রাত্র ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামালপুর হবিগঞ্জ জামাতে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উল্লিখিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট জনাব শামসুর রহমান চৌধুরী, পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন আকাশ আহমদ চৌধুরী। নযম পাঠ করেন স্বধীন আহমদ চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন হুমায়ুন কবির মোয়াল্লেম, রাফি আহমদ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী। সভাপতির সমাপ্তি বক্তব্যের মাধ্যমে দিবসটির সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দোয়া পড়ান জনাব সভাপতি সাহেব। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্থানীয় কায়েদ সোহাগ আহমদ চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৮ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিল।

ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী

নাসেরাবাদ

গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ জুমুআ অত্র জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইয়াদ আলী। নযম গেয়ে শুনান জনাব মোহাম্মদ শাহ জামাল। বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মজিবর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূইয়া মোয়াল্লেম, জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি সাহেব।

এ,এইচ,এম, জহিরউদ্দীন

শাহবাজপুর

গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করি খাকসার।

এরপর নযম পাঠ করেন স্থানীয় জামাতের খোদ্দাম আউয়াল আহমদ। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন জনাব শাহজাহান মিয়া মোয়াল্লেম, শাহবাজপুর ও প্রেসিডেন্ট সাহেব। এই সভায় উপস্থিতি সংখ্যা ছিল ২৭ জন।

সবশেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফরহাদ আলী

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

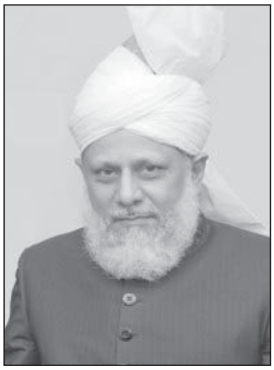

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

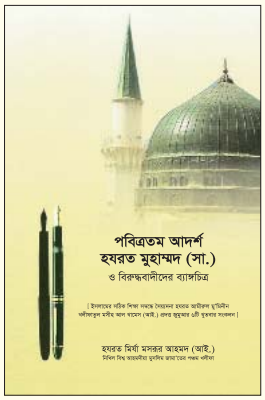

আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ রীতি অনুযায়ী আলো এবং সত্য সর্বদা জয়যুক্ত হয়ে থাকে। যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক লোক তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলদের বিরোধীতা করে ঠিকই কিন্তু পরিণতিতে খোদার ক্রোধভাজন হয়। একইভাবে আজও কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধীতায় মত্ত আছে। তাদের পরিণতিও আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনই কতক মানুষ বাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ২০০৬ সালে মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র মূলক কিছু কার্টুন আঁকে তাদের পত্র-পত্রিকায়।

২০০৬ সালের ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মীর্যা মসরূর আহমদ (আই.) একাধারে ৫টি খুতবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর শান তথা মর্যাদার উপর প্রদান করেন। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০, ১৭, ২৪ এবং মার্চ মাসের ০৩ ও ১০ তারিখে উক্ত খুতবাগুলি প্রদান করেন। বইটিকে সমৃদ্ধ করার মানসে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর আরো ১টি খুতবা সংযোজন করা হলো।

উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

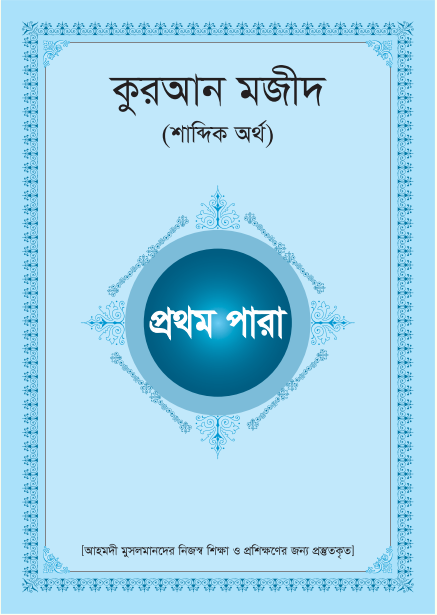

বর্তমান যুগে আমাদের নিকট কুরআন কেবল বাহ্যিকভাবে মূল্যবানরূপে পরিগনিত হচ্ছে। অধিকাংশই কুরআনের ভিতরে লুক্কায়িত মণি-মুক্তা আহরণের চেষ্টাই করে না। এ কারণে কুরআন মজীদের অর্থ পরিপূর্ণভাবে বুঝার স্বার্থে এই প্রথম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মজীদের প্রথম পারার শাব্দিক অনুবাদ আপনাদের সামানে উপস্থাপন করা হল। আশা করি জামা'তের সকলেই এ থেকে উপকৃত হবেন।

এটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক **"আহমদী"** পত্রিকার সকল সম্মানিত গ্রাহককে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে যাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার বিনীত আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

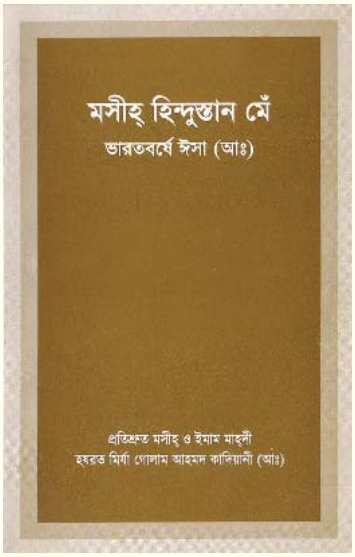

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) **'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৯ সালে প্রণয়ন করেন।

এখানে তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস, ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ এবং তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে আগমন এবং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এটি অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 79 | 20th Issue

The Fortnightly Ahmadi
Since 1922

30th April, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্তত আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা
ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

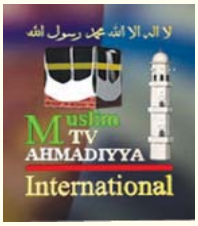

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com